

(খ) অক্ষিপটের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Retina):

চক্ষুর গঠনবৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে হইলে পৃথকভাবে অক্ষিপটের আলোচনা আবশ্যক।

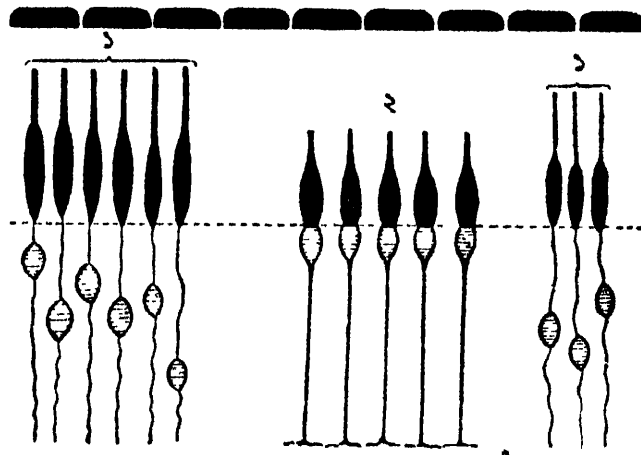
অক্ষিপট হইল সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল স্তর (most sensitive layer)। ইহা স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুকোষ লইয়া গঠিত। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলি অক্ষিগোলকের দ্বিতীয় এবং প্রথম স্তর (choroid ও sclerotic coat) ছিন্ন করিয়া একটি স্নায়ুপথ (nerve tract) গঠন করিয়াছে এবং উহা শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কের চাক্ষুষ সংবেদন কেন্দ্রে (visual centre-এ) পৌঁছিয়াছে।

অক্ষিপটটি সমগ্র অক্ষিগোলকের অন্তর্ভাগ ব্যাপিয়া আছে এবং উহা দুই পাশে সিলিয়ারি পেশীর নিকট আসিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অক্ষিপটের কেন্দ্রস্থলে তারারক্তের বিপরীত দিকে পীতাভ বিন্দু (yellow spot) আছে। ইহার কেন্দ্রটি অবনমিত (depressed)—ইহাকে বলে ‘ফোভিয়া’ (fovea centralis)।

যদি অক্ষিপটের প্রস্থচ্ছেদ (cross-section of the retina) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে দশটি স্তর দেখা যায়।^{২৪} ইহাদের মধ্যে নবম স্তরটি চাক্ষুষ সংবেদনের প্রকৃত ‘গ্রাহক’ বা ‘ধারক’ (true receptors বা end-organs)। এই নবম স্তরে দুই প্রকারের কোষ থাকে। কতকগুলি কোষ দেখিতে ক্ষুদ্র দণ্ডের আয় লম্বা—ইহাদের বলা হয় দণ্ডাকৃতি কোষ বা দণ্ডকোষ (rod cells); আবার কতকগুলি কোষ চূড়া বা শঙ্কু (cone)-এর আয়—ইহাদের বলা হয় শঙ্কুকোষ বা চূড়াকৃতি কোষ (cone cells)। (৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। দিবালোকে পীতাভবিন্দু তথা ফোভিয়া অতিমাত্রায় সংবেদনশীল থাকে; তখন শঙ্কুকোষগুলি কার্য করে এবং ইহাদের মাধ্যমে যে সংবেদন জন্মে, তাহা বিভিন্ন বস্তুর

২৪ এই দশটি স্তর হইল : (১) Membrana limitans interna ; (২) Layer of optic nerve fibres ; (৩) Ganglionic layer ; (৪) Inner molecular layer ; (৫) Inner nuclear layer ; (৬) Outer molecular layer ; (৭) Outer nuclear layer ; (৮) Membrana limitans externa ; (৯) Layer of rods and cones এবং (১০) Layer of Pigment cells.

রঙ বা বর্ণ (যথা, লাল, সবুজ, নীল, হলুদ) সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে।
অপর পক্ষে, সন্ধ্যা বা গোধূলির আলোকে বা স্নান আলোকে
দণ্ডকোষগুলি কার্য করে—ইহারা কিন্তু বর্ণসংবেদন জন্মাইতে পারে না।
অক্ষিপটের কেন্দ্রবিন্দু (fovea centralis)-এতে কেবল মাত্র শঙ্কুকোষ
থাকে এবং তাহার পর শঙ্কুকোষ ও দণ্ডকোষ পাশাপাশি থাকে; কিন্তু
ক্রমশঃ অক্ষিপটের প্রান্তসীমার দিকে শঙ্কুকোষ কমিয়া যাইতে থাকে এবং
শেষ পর্যন্ত কেবল দণ্ডকোষ থাকে। যেহেতু, ফোভিয়াতে কেবল মাত্র
শঙ্কুকোষ থাকে, সেই হেতু উহার অন্ধকার-প্রতিযোজন (dark adapta-
tion)-এর ক্ষমতা নাই। স্বল্পালোকে বা স্নান আলোকে কিন্তু অক্ষিপটের
প্রান্তসীমা সর্বাপেক্ষা উদ্দীপিত হয়।



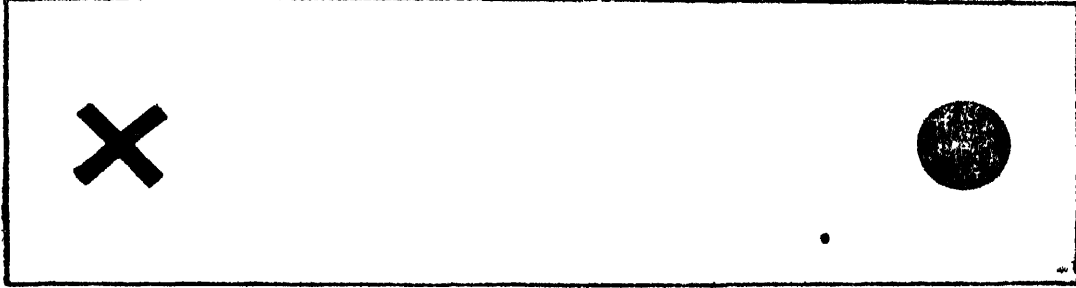
৮নং চিত্র।

অক্ষিপটের কোষ-স্তর।

১—দণ্ড-কোষ ; ২—শঙ্কু-কোষ।

চাক্ষুষ স্নায়ুগুলি যেখানে অক্ষিপট হইতে বাহির হইয়াছে, সেইখানে
শঙ্কুকোষ বা দণ্ডকোষ কোনটিই নাই; সেইজন্য এই অংশে যদি
কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহা হইলে কোন সংবেদনই হয় না।
এই কারণে এই অংশকে অন্ধবৃত্তক বা দৃষ্টিহীন বিন্দু (blind spot)
বলে। একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা উহার অবস্থান জানা যায়। পরপৃষ্ঠার
ছবিতে বাম চক্ষু বন্ধ করিয়া ডান চক্ষু দ্বারা গুণচিহ্নটি দেখিতে হইবে।
এই অবস্থায় ছবিটি প্রায় ৩০।৩৫ সেন্টিমিটার দূরে ধরিলে গুণচিহ্ন ও
গোলক উভয়ই দেখা যাইবে। তাহার পর ধীরে ধীরে দ্রষ্টা উহাকে নিজের

দিকে সরাইয়া আনিলে হঠাৎ এক সময় গোলকটি যেন ‘অস্তহিত’ হইয়া যাইবে। সুতরাং এই অবস্থায় গোলকটির প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিহীন বিন্দুতে পড়িল বলিয়া উহাকে দেখা গেল না বুঝিতে হইবে।



৯নং চিত্র।

দৃষ্টিহীন বিন্দুর অবগান-নির্ণয়।

(গ) চাক্ষুষ সংবেদনের বিভিন্ন পর্যায় (Different stages of Visual Sensation) :

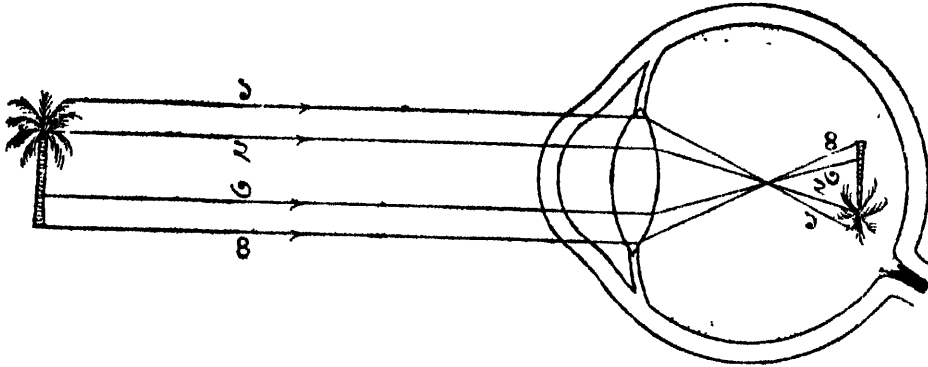
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপযুক্ত উদ্দীপক হইল আলোকরশ্মি।^{২৫} যে বস্তুটি আমরা দেখি তাহার প্রতিটি বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া চক্ষুর উপর আসিয়া পড়ে। ঐ সকল আলোকরশ্মি কনীনিকার মধ্যস্থ তারারন্ধ্রের পথে আসিয়া লেন্সের উপর পড়ে এবং তথা হইতে অক্ষিগোলকের মধ্যস্থ স্বচ্ছ দ্রবীভূত পদার্থের মধ্য দিয়া যাইয়া অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়। তাহার ফলে উহার কোষগুলি উদ্দীপিত হয় এবং ঐ স্নায়বিক উদ্দীপন (যাহা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অনুরূপ) স্নায়ুপথে শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিস্কের চাক্ষুষ সংবেদন কেন্দ্রে (পৃঃ ১৭১) উপনীত হয়। তখন চাক্ষুষ সংবেদন জন্মে। বলা বাহুল্য, ইহাদের কোন একটি কোন কারণে ক্রটিযুক্ত বা নষ্ট হইলে চাক্ষুষ সংবেদন ব্যাহত হইবে অথবা একেবারেই হইবে না।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অক্ষিপটের উপর যে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহা প্রকৃত বস্তুর বিপরীত (inverted image)।^{২৬}

২৫ আলোকরশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করিবার জন্ত যে ‘একক’ (unit) ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মিলিমাইক্রন (millimicron) বলা হয়। এক মিলিমাইক্রন হইল এক মিলিমিটারের ১০,০০০ ভাগ। সাধারণতঃ ৪০০ হইতে ৮০০ মিলিমাইক্রনের তরঙ্গ আলোক-সংবেদন সৃষ্টি করে।

২৬ কোটো তুলিবার পর ক্যামেরার ফিল্মগুলি ধৌত করিয়া আলোতে ধরিলে উহাতে যে বস্তুর ছবি তোলা হইয়াছে তাহার বিপরীত প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এইজন্ত ইহাকে *negative* বলা হয়। চক্ষুর অক্ষিপটেও ঠিক অনুরূপ ঘটনা হয়।

বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি যখন যায়, তখন উহা সরল রেখার পথে যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষগোচর বস্তু হইতে যে সকল রশ্মি চক্ষুর প্রতি ধাবিত হয়, সেগুলি সমান্তরালভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু লেন্সে প্রবেশ করিয়া উহারা বাঁকিয়া যায়—যেটি লেন্সের যত বেশী প্রান্তদেশে আসিয়া পড়ে সেটি তত বেশী বাঁকিয়া যায়। ইহার ফলে আলোকরশ্মিসমূহ লেন্সকে অতিক্রম করার পর অক্ষিগোলকের মধ্যে (অর্থাৎ vitreous body-তে আসিয়া) কোন এক বিন্দুতে মিলিত হয়। (১০ নং ছবি দ্রষ্টব্য)। লেন্সের বাহিরে আসিয়া আলোকরশ্মি আর বাঁকিয়া যায় না এবং উহারা আবার সরল পথে চলিতে থাকে। নিম্নোক্ত চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, ১নং রশ্মি যাহা দৃষ্ট বস্তুর (এখানে বৃক্ষের) উপরিভাগ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, তাহা সর্বনিম্নে চলিয়া আসিয়াছে এবং উহার সর্বনিম্ন অংশ হইতে যে রশ্মি (৪নং রশ্মি) বিচ্ছুরিত হইয়াছিল তাহা সর্বোপরি চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং অক্ষিপটে যে প্রতিচ্ছবি



১০ নং চিত্র।

অক্ষিপটে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিচ্ছবি কিরূপে বিপরীত হইয়া প্রতিকলিত হয়, তাহাই দেখান হইয়াছে।

পড়িল, তাহা প্রকৃত বস্তুর প্রতিচ্ছবির বিপরীত। মস্তিষ্কে যখন উহার উদ্দীপন পৌঁছে, মস্তিষ্ক তখন উহাকে সোজাভাবে দেখে।^{২৭}

২৭ একদল লোক দূরের জিনিষ দেখিতে পার না। ইহাদের অক্ষিগোলক স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা এবং লেন্স উত্তল হইয়া পড়ে। দৃষ্ট বস্তুর ছবি ইহাদের অক্ষিপটের ঠিক উপরে না পড়িয়া সম্মুখে পড়ে। ইহাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে (এইজন্য ইহাকে বলে *Nearsightedness* বা *astigmatism*) ; অপর আর একদল লোক দূরের জিনিষ দেখিতে পার, কিন্তু কাছের জিনিষ দেখিতে পার না (এই অবস্থাকে বলে দূরদৃষ্টিসম্পন্নতা বা *farsightedness*)। ইহাদের অক্ষিগোলক অতিরিক্ত ছোট এবং লেন্স পাতলা হইয়া পড়ে। ইহাদের ক্ষেত্রে দৃষ্ট বস্তুর ছবি অক্ষিপটের পশ্চাতে বাইরা পড়ে। প্রথম ক্ষেত্রে *minus* এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে *plus* শক্তির চশমা ব্যবহার করিলে ত্রুটি দূর হয়।

(ঘ) চক্ষু ও আলোকচিত্রগ্রহণ-যন্ত্র (Eye & Camera) :

আমরা উপরে চক্ষুর গঠন ও কার্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে দেখিতে পাই যে, আলোকচিত্রগ্রহণ-যন্ত্র বা ক্যামেরার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে ; যথা—

(১) চক্ষুর কনীনিকা (iris) যেমন সঙ্কুচিত বা বিস্তারিত করিয়া চক্ষুমধ্যে কী পরিমাণ আলোক প্রবেশ করিবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেইরূপ ক্যামেরার ডায়াফ্রাম (diaphragm) নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে কী পরিমাণ আলোক ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করিবে, তাহা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। (২) চক্ষুর মুকুর বা লেন্সে দৃষ্ট বস্তু হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া যেমন অক্ষিপট (retina)-তে পড়ে, ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমেও যে বস্তুর ছবি তোলা হইতেছে তাহার ছবি ফিল্ম (film)-এ প্রতিফলিত হয়। (৩) অক্ষিপটে দৃষ্ট বস্তুর ছবি বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হয়, ক্যামেরার ফিল্মের উপরও ঐরূপ হয়। (৪) চক্ষুর ক্ষেত্রে তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়া ব্যতীত অন্য কোন পথে কোন আলোক প্রবেশ করিতে পারে না ; ক্যামেরার ক্ষেত্রেও সম্মুখস্থ ছিদ্র ব্যতীত অন্য কোন পথে আলোক প্রবেশের পথ থাকে না। ক্যামেরার ছিদ্রপথের সম্মুখস্থ আবরণ বন্ধ রাখিলে যেমন উহার ভিতরে আলোক প্রবেশ করে না, সেইরূপ চক্ষুর পাতা বন্ধ রাখিলে উহাতে কোন আলোক প্রবেশ করিতে পারে না।

বলা বাহুল্য যে, কোন কৃত্রিম যন্ত্র কোন সজীব প্রাণীর অঙ্গের পূর্ণভাবে সমতুল্য হইতে পারে না। সুতরাং চক্ষু ও ক্যামেরার মধ্যে মিল থাকিলেও ঐ দুইটি সম্পূর্ণ একই প্রকারের নহে। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য আছে :—

(১) দূরের ও কাছের জিনিষ দেখিবার জন্য প্রয়োজনমত চক্ষুর লেন্সের আকার পরিবর্তন করা যায়—উহাকে কখনও উত্তল, কখনও হ্রাস করা যায় (পৃ: ৫৯৮)। ক্যামেরার লেন্স শক্ত কাঁচ দ্বারা তৈয়ারী বলিয়া ঐরূপ সুবিধা নাই—অন্যভাবে উহার ‘ফোকাসিং’-এর ব্যবস্থা থাকে। (২) ক্যামেরার ফিল্মে একবারই একটি ছবি তোলা যায় এবং উহাকে পরিবর্তন না করিয়া ছবি তুলিলে ছবি নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু চক্ষুর অক্ষিপট প্রতিনিয়তই নূতন নূতন বস্তুর ‘ছবি’ গ্রহণ করিতেছে—উহাকে পরিবর্তনের পৃথক কোন ব্যবস্থা নাই (পৃ: ৫৭৪)। (৩) অক্ষিপটে দৃষ্ট বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হওয়া মাত্র আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় উহা কিসের ছবি, কোন্ বস্তুর ছবি ইত্যাদি বুঝিতে পারি ; কিন্তু ক্যামেরায়

ব্যবহৃত ফিল্মটি বাহির করিয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছাপিলে (develop ও print করিলে) ছবিটি পাওয়া যায়। (৪) চক্ষুর অক্ষিপটে যেমন পৃথক পৃথক বর্ণের নির্দিষ্ট মণ্ডল (retinal zone) আছে এবং একটি বিন্দু দৃষ্টিহীন, ক্যামেরার ফিল্মে ঐরূপ কোন পৃথক পৃথক স্থান নাই। (৫) সাধারণ ক্যামেরার ছবিতে বস্তু-বিশেষের 'ঘনত্ব' দেখা যায় না, কিন্তু আমরা দুই চক্ষু দ্বারা যখন ঘনবস্তু (solid object) দেখি, তখন উহার ঘনত্ব বুঝি (পৃঃ ৬৮০)। (৬) সাধারণ ফিল্মে বস্তু-বিশেষের বিভিন্ন বর্ণ (colour) বুঝা যায় না (উহাতে গৃহীত ছবিতে কেবল সাদা-কালো বা আলো-ছায়ার পার্থক্য থাকে), কিন্তু চক্ষুর অক্ষিপটে স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন দিবালোকে শঙ্কুকোষগুলি কাজ করে) দৃষ্ট বস্তুর বিবিধ বর্ণ সম্বন্ধে সংবেদন জন্মে। (৭) চক্ষুর জল উহার লেন্সকে সর্বদা পরিষ্কার রাখে, কিন্তু ক্যামেরার লেন্সকে পরিষ্কার রাখিবার ঐরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

১১। বর্ণ-সংবেদন সম্বন্ধীয় কয়েকটি ঘটনা (Some phenomena relating to Colour Sensation) :

পূর্ব অনুচ্ছেদে চাক্ষুষ সংবেদন কি ভাবে সংঘটিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, দিবালোকে যখন শঙ্কুকোষগুলি উদ্দীপিত হয়, তখন বর্ণ সংবেদন জন্মে। এই বর্ণ-সংবেদনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। বর্তমান অনুচ্ছেদে এইগুলি আলোচনা করা হইল।

(ক) প্রাথমিক বা মূল বর্ণ (Primary Colours) :

প্রাথমিক বর্ণের সুনির্দিষ্ট তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে, কারণ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রাথমিক'-পদটি বিভিন্ন বর্ণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে।

সূর্যের আলোর রঙ সাদা। বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্র (spectroscope)-এ ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে উহার মধ্যে সাতটি রঙের সমাবেশ পাওয়া যায়। এই সাতটি রঙ হইল,—বেগুনী (violet), নীলবেগুনী (indigo), নীল (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow), কমলা (orange) এবং লাল (red)।^{২৮} কেহ কেহ এই সাতটিকে প্রাথমিক বর্ণ বলেন। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, সাতটি বর্ণের সকল-গুলিই সমপর্যায়ভুক্ত নহে; যেমন, লাল ও হলুদ রঙের সংমিশ্রণে কমলা রঙ হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, লাল, হলুদ, সবুজ ও নীল (R, Y, G, B) হইল প্রাথমিক বর্ণ। শারীরবিজ্ঞান (Physiology)-র দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহা

২৮ এই সাত বর্ণের আদি অক্ষর গ্রহণ করিয়া ইহাদের সংক্ষেপে একত্রে বলা হয় cibgyor।



সূর্যের স্বেত আলোকরশ্মিকে বিশ্লেষণের ফলে বিবিধ প্রাথমিক বর্ণ দেখা যাইতেছে ।

(পৃ: ৫৬৪)

গ্রহণযোগ্য, কারণ অক্ষিপটে এই চারি বর্ণের জন্য চারিটি মণ্ডল (zone) আছে (পৃ: ৫৬৯)। কিন্তু, পদার্থবিদ্যা (Physics)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একদল বৈজ্ঞানিক হলুদ রঙকে প্রাথমিক বর্ণ মনে করেন না; তাঁহাদের মতে লাল, সবুজ ও নীল (R, G, B) হইল প্রাথমিক। কারণ তাঁহারা বলেন যে, বিশেষ অনুপাতে লাল ও সবুজ মিশাইলে হলুদ রঙের আবির্ভাব ঘটে এবং লাল, সবুজ ও নীল রঙের সংমিশ্রণে সাদা রঙের উৎপত্তি।

চিত্রশিল্পীর প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লাল, হলুদ ও নীল (R, Y, B) হইল প্রাথমিক; কারণ এই তিন রঙের মিশ্রণের তারতম্য ঘটাইয়া শিল্পী প্রকৃতির বহু বিষয়েরই ছবি আঁকিতে পারেন।

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই প্রশ্নের বিশেষ অর্থ নাই; কারণ আমাদের যখনই বর্ণসংবেদন হয়, তখনই উহা একটি 'সরল' সংবেদন রূপে প্রতীত হয়। যেমন, যখন কেহ কমলা রঙ প্রত্যক্ষ করে, তখন উহাকে লাল ও হলুদ বর্ণের সংমিশ্রণভাবে দেখে না; সেইরূপ সকল প্রাথমিক বর্ণের সমন্বয়ে সাদা রঙের উৎপত্তি, কিন্তু তাই বলিয়া কোন সাদা রঙ দেখিবার সময় সব কয়েকটি রঙের যুগপৎ সংবেদন হয় না।^{২৯}

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ণবিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত জটিল। ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদির পার্থক্য অনুসারে ইহাদের স্থান নির্ণয়ের জন্য যদি কোন রেখাঙ্কন ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে সরলরেখার সাহায্যে ইহাদের স্থান নির্দেশ করা যায় না। এইজন্য একটির ভূমির উপর অপরটি স্থাপিত এইরূপ বিপরীতমুখী দুইটি 'পিরামিড' বা শঙ্কু অঙ্কন করিয়া বর্ণবিজ্ঞান বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। ইহাকে বলে বর্ণ শিখর (colour pyramid)। সাদা এবং কালো রঙকে দুইটি শঙ্কুর শীর্ষে স্থাপন করা হয়; ঐ দুই শীর্ষকে সংযোগকারী রেখার উপর ধূসরবর্ণকে দেখান হয় এবং উহাদের ভূমি (base)-এর চারিকোণে লাল, হলুদ, নীল, এবং সবুজ রঙের স্থান নির্দেশ করা হয়।^{৩০}

(খ) পরিপূরক বর্ণ (Complementary colours) :

প্রতি বর্ণেরই তাহার বিপরীত একটি পরিপূরক বর্ণ থাকে। বিশেষ

২৯ তুলনীয় : "...psychologically regarded, all colours are equally simple : it is impossible, for instance, by introspective analysis to split up orange into yellow and red." (Titchener, *Text-book of Psychology*, p. 85).

৩০ বিস্তারিত বর্ণনার জন্য Titchener, *Text-book*, p. 63 দ্রষ্টব্য।

অনুপাতে উহাদের মিশাইলে বর্ণহীন সংবেদন (achromatic or colourless sensation) হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, লাল এবং সবুজ (R-G) রঙ, আবার হলুদ এবং নীল (B-Y) রঙ হইল পরস্পরের পরিপূরক।

(গ) অনুবেদন (After-sensation বা after-image) :

উদ্দীপকের দ্বারা কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইলে সংবেদন হয়। কিন্তু উদ্দীপক সরাইয়া লইবামাত্র সকলক্ষেত্রে সংবেদনের পরিসমাপ্তি হয় না। অনেকক্ষেত্রে উদ্দীপক অপসারণের অব্যবহিত পরেও অল্পক্ষণ যেন ক্ষীণভাবে সংবেদন চলিতে থাকে। এই প্রকার সংবেদনকে অনুবেদন বলে।

চাক্ষুষ উদ্দীপনের ক্ষেত্রে অনুবেদন দুই প্রকারের হইতে পারে : **সবর্ণ (positive)** এবং **অসবর্ণ (negative)**।^{৩১} সবর্ণ সংবেদনের ক্ষেত্রে মূল সংবেদন এবং অনুবেদন একই প্রকারের হয় (তবে তীক্ষ্ণতার পার্থক্য থাকে)। যেমন, ভোরবেলায় উদীয়মান সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া যদি চোখ বুজিয়া ফেলা যায় বা ঘরের ভিতরে শাদা দেওয়ালের দিকে তাকান যায়, তাহা হইলে মনে হয় চোখের সামনে তখনও কী যেন জল্ জল্ করিতেছে। সেইরূপ, একটি জলন্ত কাঠি যদি কিছুক্ষণ চক্রাকারে চোখের সামনে ঘুরান যায় এবং তাহার পর চোখ বুজিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলেও অল্পক্ষণ মনে হইবে যেন আগুন চক্রাকারে ঘুরিতেছে। এইগুলি হইল সবর্ণ অনুবেদন। আবার, যদি লালরঙের কোন কাগজের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তাহার পরই একটি সাদা কাগজের দিকে তাকান যায়, তাহা হইলে ঐ সাদা কাগজে অল্পক্ষণ যেন একটি ক্ষীণ সবুজ রঙের ছাপ দেখা যাইবে। এক্ষেত্রে মূল সংবেদন ছিল লালরঙের, কিন্তু অনুবেদনটি হইল সবুজ রঙের। ইহাকে অসবর্ণ অনুবেদন বলা যায়। অসবর্ণ অনুবেদনের ক্ষেত্রে মূল উদ্দীপনের সময় যে রঙটি দেখা যায়, অনুবেদনের সময় তাহার পরিপূরক বর্ণ ক্ষীণভাবে অল্পক্ষণ দেখা যায়।^{৩২}

৩১ চাক্ষুষ সংবেদন ব্যতীত অন্যপ্রকার উদ্দীপনের ক্ষেত্রে বিপরীত অনুবেদন (negative after-sensation) সম্ভব নহে।

৩২ এই বিষয় একটি সহজ পরীক্ষণ করা যাইতে পারে। দুইটি ছোট কার্ড লইতে হইবে। একটির উপর একটি পরিষ্কার সাদা কাগজ মারিতে হইবে, অপরটির উপর একটি হলুদ রঙের কাগজ মারিয়া দিতে হইবে। আবার হলুদ রঙের কাগজের মধ্যস্থলে ছোট গোলাকার বা চতুর্ভুজ নীল রঙের আর একটি কাগজ আটকাইয়া দিতে হইবে। এখন যদি কিছুক্ষণ রঙীন কার্ডের দিকে তাকাইয়া সাদা কার্ড দেখা যায়, তাহা হইলে সাদা কার্ডটির মধ্যস্থল হলুদ রঙ এবং চারিপাশ নীল আভাযুক্ত মনে হইবে।

(ঘ) বর্ণ-বৈসাদৃশ্য (Colour-contrast) :

কোন বর্ণের ঔজ্জ্বল্য তাহার সহিত সহ-অবস্থানকারী অথবা উহার অব্যবহিত পরে প্রত্যক্ষগোচর অন্যান্য বর্ণের সহিত তুলনায় হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। যেমন, উজ্জ্বল আলোক দ্বারা সজ্জিত ঘর হইতে যদি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে অন্ধকার ঘরের অন্ধকার যেন গাঢ়তর বলিয়া প্রথমে প্রতীত হয়।

এই বৈসাদৃশ্য দুই প্রকারের হইতে পারে—যুগপৎ বা সমকালীন (simultaneous) এবং অনুবর্তী (successive)। যদি একটি কালো এবং একটি সাদা কাগজের উপর উহাদের অপেক্ষা ছোট আকারের দুইটি ধূসর বর্ণের কাগজ লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে ধূসর বর্ণ কাগজটি কালো কাগজের উপর লাগান হইয়াছে সেটি অপর ধূসরবর্ণের কাগজ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর মনে হইবে। যদি একটি রঙীন কাগজের উপর ধূসরবর্ণের টুকরা টুকরা কাগজ মারিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ধূসর বর্ণের অংশগুলিতে রঙীন কাগজটি যে রঙের তাহার পরিপূরক বর্ণের ক্ষীণ আভা দেখা যায়। এইগুলিকে বলা যায় যুগপৎ বা সমকালীন বৈসাদৃশ্য।

আবার অনুবর্তী বৈসাদৃশ্য বলিতে অসবর্ণ অনুবেদনকে বুঝায়।

(ঙ) বর্ণান্ধতা (Colour-blindness) :

সকল ব্যক্তির সকল বর্ণের সংবেদন ক্ষমতা থাকে না। কোন বর্ণ সম্বন্ধে যাহার সংবেদন জন্মে না তাহাকে বর্ণান্ধ (colour-blind) বলে। বর্ণান্ধতা দুই প্রকারের, আংশিক (partial) এবং সম্পূর্ণ (complete)। কেহ কেহ একটি বিশেষ বর্ণ দেখিতে পায় না, এবং ঐ বর্ণ-বিশিষ্ট কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে তাহা ঐ বর্ণের পরিপূরক বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত বলিয়া তাহার নিকট প্রতীত হয়। যেমন, কোন কোন ব্যক্তি সবুজ বর্ণের ক্ষেত্রে অন্ধ। তাহারা যদি সবুজ বর্ণের কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে ঐ বস্তু হয়ত লালবর্ণের বলিয়া মনে হয়; যেমন, তাহারা সবুজ ঘাস, গাছের সবুজ পাতা ইত্যাদি দেখিয়া বলিবে লাল ঘাস, লাল পাতা। আবার কাহারও কাহারও একাধিক বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধতা থাকিতে পারে। আবার কেহ কেহ সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ হইতে পারে—ইহাদের নিকট নানাবর্ণ শোভিত সমগ্র জগৎ ধূসর বলিয়া প্রতীত হয়।^{৩৩}

৩৩ বর্ণান্ধতা সাধারণতঃ বংশানুক্রমিকভাবে আসে। পুরুষদের ভিতর ৮%, এবং নারীদের ভিতর ৩-৪%-এর কোন না কোন প্রকারের বর্ণান্ধতা আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

(ঢ) বর্ণ-সংমিশ্রণ (Colour-mixture) :

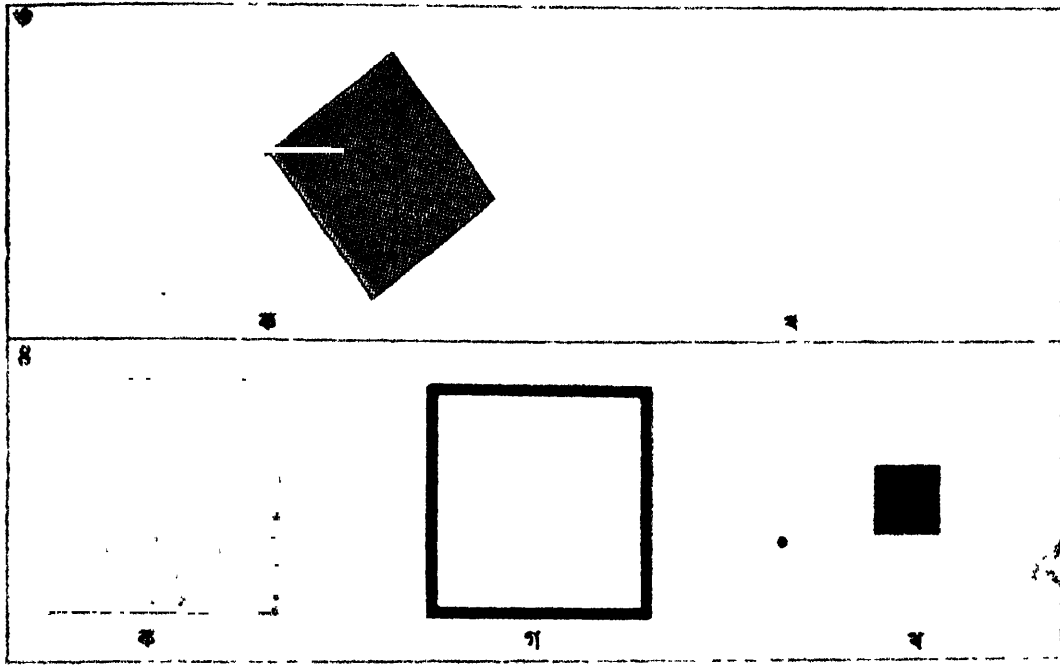
বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণকে বর্ণ-সংমিশ্রণ (Colour-mixture) বলে। এই বর্ণ-সংমিশ্রণ সম্বন্ধে তিনটি প্রধান নিয়ম আছে—ইহাদের বর্ণসংমিশ্রণ সম্বন্ধীয় নীতি (Laws of Colour-mixture) বলে। (ক) প্রথম নিয়ম হইল যে, যদি দুইটি পরিপূরক বর্ণকে বিশেষ অনুপাতে মিশান যায়, তাহা হইলে যে মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইল ধূসর-বর্ণ এবং এই ধূসর বর্ণের ঔজ্জ্বল্য^{৩৪} দুইটি মিশ্রিত বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের মাঝামাঝি হইবে। (খ) দ্বিতীয় নিয়ম হইল যে, পরিপূরক নহে' এইরূপ দুইটি বর্ণকে বিশেষ অনুপাতে মিশাইলে যে বর্ণ হইবে, তাহার বর্ণমাত্রা (hue) মিশ্রিত দুইটি বর্ণের মাঝামাঝি হইবে ; যেমন, লাল ও হলুদ রঙকে মিশাইলে কমলা (orange) রঙের উৎপত্তি হয়। (গ) তৃতীয় নিয়মটি প্রথম নিয়মের রূপান্তর। একটি মিশ্র-বর্ণকে আর একটি মিশ্র-বর্ণের সহিত মিশাইলে যে বর্ণ হইবে, তাহা হইবে ধূসর বর্ণ। আবার এই মিশ্র বর্ণের ঔজ্জ্বল্য মিশ্রিত বর্ণদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্যের মাঝামাঝি হইবে।

একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রকে বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্ট প্রাথমিক বর্ণে রঞ্জিত সাতটি অংশে বিভক্ত করিয়া যদি উহাকে চক্রাকারে খুব জোরে ঘুরান যায়, তাহা হইলে বর্ণ-সংমিশ্রণের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ মনে হইবে যে, একটি সাদা রঙের চাকা ঘুরিতেছে। এই প্রকার রঙীন বৃত্তাকার ক্ষেত্রকে বর্ণচক্র (Colour wheel) বলে। (মাত্র কয়েকটি রঙ ব্যবহার করিয়াও এরূপ চক্র গঠন করা যায়)।

(ছ) আলোক এবং অন্ধকার প্রতিযোজন (Light and Dark-adaptation) :

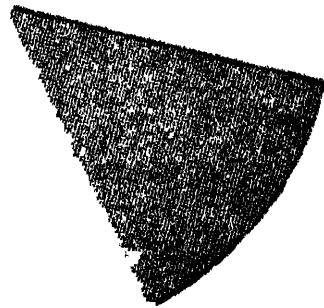
আলোর ঔজ্জ্বল্য যদিও রশ্মির বিস্তৃতি (amplitude) ও শক্তি (energy)-র উপর নির্ভর করে, তাহা হইলেও ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে প্রতীতি ব্যক্তি-বিশেষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার উপর কতকাংশে নির্ভরশীল। মধ্যাহ্নকালে সূর্যালোকে আলোকিত পথ হইতে যখন আমরা সিনেমা বা থিয়েটারের অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করি, তখন প্রথমে কিছুই দেখা যায় না ; কিন্তু একটু পরে প্রেক্ষাগৃহের আসন ও দর্শকদের অম্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহার কারণ হইল যে, অন্ধকারে স্বল্পক্ষণ অবস্থানের ফলে চক্ষুদ্বয় উহাতে অভ্যস্ত হইয়া

^{৩৪} আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের দ্বারা বর্ণমাত্রা (hue) নির্ধারিত হয় এবং উহার বিস্তৃতি (amplitude) দ্বারা উহার শক্তি তথা ঔজ্জ্বল্য (brightness বা luminance) নির্ধারিত হয়।



(৩) পরিপূরক বর্ণ (পৃঃ ৫৬৫)

(৪) অনুবেদন সম্বন্ধে পরীক্ষণ—প্রথমে 'ক' অথবা 'খ' চক্ষুগোলের প্রান্তিক
কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তৎপরেই মধ্যস্থ 'গ' চিহ্নিত স্থানে গুরু চক্ষু
দেখিলে অনুবেদনের ফল বুঝা যাইবে। (পৃঃ ৫৬৬)



বর্ণচক্র (পৃঃ ৫৬৮)

গেল। ইহাকে অন্ধকার-প্রতিযোজন (dark-adaptation) বলে। আবার অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ হইতে আলোকিত পথে আসিলে প্রথমে বাহিরের আলোক অতি উজ্জ্বল বলিয়া প্রতীত হয়; অল্পক্ষণ পরে উহা আর তত উজ্জ্বল বোধ হয় না। ইহা হইল আলোক-প্রতিযোজন (light-adaptation)

(জ) পুর্কিন্য়ী ঘটনা (Purkinjie phenomenon) :

দিবালোকে বা অত্যুজ্জ্বল কৃত্রিম আলোকে এবং গোধূলির আলোকে বা স্নান নিম্প্রভ আলোকে বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের কিরূপ তারতম্য ঘটে সে বিষয়ে অষ্ট্রিয়াবাসী পুর্কিন্য়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের যে পার্থক্য আবিষ্কার করেন, তাহাই ‘পুর্কিন্য়ী ঘটনা’ (Purkinjie phenomenon) নামে পরিচিত। তিনি দেখান যে, অত্যুজ্জ্বল আলোকে বা দিবালোকে অভ্যস্ত বা প্রতিযোজিত চক্ষুর নিকট লাল এবং হলুদ বর্ণ (এবং উহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন কমলা রঙ) উজ্জ্বলতর বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু স্নান আলোকে বা অন্ধকারে প্রতিযোজিত চক্ষুদ্বয়ের পক্ষে সবুজ এবং নীল রঙ অত্যান্ত রঙ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়।

(ঝ) অক্ষিপটের মণ্ডল (Retinal zones) :

অক্ষিপটের সকল অংশের সংবেদনশীলতা সমান নহে। আমরা পূর্বে (পৃ: ৫৬০) দেখিয়াছি যে, অক্ষিপটের যে অংশ হইতে অন্তর্মুখী স্নায়ু বাহির হইয়াছে, সেখানে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়িলে, চাক্ষুষ সংবেদন হয় না। উহা হইল ‘অন্ধ বিন্দু’ (blind spot)। আবার বাকী অংশেও সকল বর্ণের সংবেদন হয় না। কেন্দ্রবিন্দু (fovea centralis)-তে প্রতিচ্ছবি পড়িলে সকল বর্ণের সংবেদন হয়। অক্ষিপটের প্রান্তদেশে প্রতিচ্ছবি পড়িলে কোন বর্ণেরই সংবেদন হয় না। মধ্য মণ্ডল (intermediate-zone)-এ কেবল নীল ও হলুদ বর্ণের সংবেদন হয়। সুতরাং বর্ণসংবেদন অনুসারে অক্ষিপটকে তিনটি মণ্ডলে ভাগ করা যায় : কেন্দ্রমণ্ডল বা সর্ববর্ণমণ্ডল (central বা panchromatic zone), মধ্যমণ্ডল (intermediate zone) এবং প্রান্ত-মণ্ডল বা বর্ণহীন মণ্ডল (peripheral বা achromatic zone)।^{৩৫}

৩৫ পরিমাপক যন্ত্র ‘পেরিমিটার’ (Perimeter)-এর সাহায্যে বিবিধ বর্ণমণ্ডলের অতি দৃষ্টি পরীক্ষণ করা হয়। এই যন্ত্রে একটি রঙীন চাকা (যেমন, লাল রঙের চাকা) একটি পথে ধীরে ধীরে সন্ধান হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি চক্ষু বন্ধ করিয়া একটি দ্বিতীয় মধ্য দিয়া উহা দেখিতে

১২। চাক্ষুষ সংবেদন সম্বন্ধীয় বিবিধ মতবাদ (Different Theories of Vision) :

আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে চাক্ষুষ সংবেদন-সংক্রান্ত কয়েকটি অবস্থা ও ঘটনার উল্লেখ করিলাম। এই সকল ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদের প্রবর্তন করিয়াছেন। আমরা এইবার কয়েকটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করিব।

(ক) ইয়ং-হেল্মহোলৎস্ মতবাদ (Young-Helmholtz Theory of Vision) :

এই মতবাদ ইয়ং কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং হেল্মহোলৎস্ কর্তৃক পরিমার্জিত হয়; এইজন্য এই দুইজনের নামানুসারে এই মতবাদের নামকরণ হইয়াছে। এই মতবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল নিম্নরূপ :—

(১) মূল বর্ণ (elementary colour) হইল তিনটি—সাল, সবুজ ও নীল।^{৩৬}

(২) এই তিন প্রকার বর্ণের উদ্দীপন গ্রহণের জন্য অক্ষিপট (retina)-তে তিন প্রকার ‘আলোক-রাসায়নিক পদার্থ’ (photo-chemical substance) আছে। ইহাদেরই জন্য বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে সংবেদন সম্ভব হয়।

(৩) সকল বর্ণ-সংবেদনকারী উদ্দীপকই এই তিন প্রকার পদার্থের উপর প্রক্রিয়া করে, কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায়। প্রতি পদার্থই তাহার উপযুক্ত উদ্দীপক দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত হয়।

(৪) তবে শ্বেতবর্ণের সংবেদনের ক্ষেত্রে তিনটি পদার্থই সমভাবে উদ্দীপিত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ বা কালো রঙের সংবেদনের ক্ষেত্রে ইহারা একেবারেই উদ্দীপিত হয় না।

বলা হয়। কেন্দ্রস্থলে (যেখানে পরীক্ষণ-পাত্র দুটি নিবদ্ধ রাখে) চাকাটি থাকাকালীন সে চাকাটি লাল রঙের বলিয়া দেখিতে পাইবে; কিন্তু ধীরে ধীরে উহাকে সরাইতে থাকিলে এক সময় সে চাকাটি দেখিতে পাইবে, উহা নড়িতেছে বুঝিতে পারিবে, কিন্তু উহা আর লাল রঙের বলিয়া বোধ হইবে না (হয়ত উহাকে ধূসর বর্ণের মনে হইবে)। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে চাকাটির প্রতিচ্ছবি অক্ষিপটের এমন এক মণ্ডলে পড়িতেছে যেখানে লাল রঙের সংবেদন সম্ভব নহে।

৩৬ এই তিনটি বর্ণকে আরও হুনির্দিষ্টভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয় : ‘carmine red’, ‘slightly yellowish green’ ও ‘ultramine blue’।

(৫) যদি অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন লাল বর্ণের দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিয়া কোন ধূসর বা সাদা রঙের দ্রব্য দেখা যায়, তাহা হইলে উহা ক্ষীণ সবুজ বর্ণাভ বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাকে বলা হয় অসবর্ণ অনুবেদন (**negative after-image**) (পৃ: ৫৬৬)। ইহার কারণস্বরূপ হেল্মহোলৎস্ বলেন যে, লাল রঙের উদ্দীপন গ্রহণের উপযুক্ত আলোক-রাসায়নিক পদার্থটি উদ্দীপনের ফলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ইহারই জন্ত সবুজরঙের জন্ত নির্দিষ্ট পদার্থটি সক্রিয় হইয়া উঠে।

(৬) বর্ণাক্ষতা (**colour-blindness**)-এর ব্যাখ্যা এই মতানুসারে অপেক্ষাকৃত সরল। যে ব্যক্তি লাল বা সবুজ বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ, তাহার কোন কারণে ঐ বর্ণের জন্ত নির্দিষ্ট 'পদার্থ' ক্রিয়াশীল নহে বুলিতে হইবে।

(৭) বর্ণ-সংমিশ্রণ (**colour-mixture**)-কে ব্যাখ্যা করিয়া এই মত বলে যে, তিনটি 'পদার্থের' যুগপৎ উদ্দীপন এবং গুরুমস্তিষ্কে তাহাদের পুনঃ সংশ্লেষণের ফলেই সকল প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণে সাদা রঙের সংবেদন ঘটে।

সমালোচনা :

এই মতবাদ সকলে গ্রহণ করেন না। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ইহা জটিল বর্ণ-সংবেদন প্রক্রিয়ার অতি সরল ব্যাখ্যা দান করিয়াছে ; ফলে ইহা চাক্ষুষ সংবেদন-সংক্রান্ত সকল ঘটনাকে সুষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই।

অসবর্ণ অনুবেদন (**negative after-sensation** বা **after-image**)-এর ক্ষেত্রে এই মতবাদ যে ব্যাখ্যা দিয়াছে সে সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, এই প্রকার অনুবেদন সকল ক্ষেত্রে ক্লান্তির জন্ত হয় না। কারণ অতি অল্পক্ষণ প্রত্যক্ষ করিবার পর অথবা দীর্ঘকাল চক্ষুকে বিশ্রাম দিবার পরও উপযুক্ত অবস্থায় অসবর্ণ অনুবেদন হয়। সুতরাং ক্লান্তির ফলেই যে অসবর্ণ অনুবেদন হয়, ইহা বলা সমীচীন হইবে না।

বর্ণাক্ষতা সম্বন্ধেও প্রদত্ত ব্যাখ্যা ত্রুটিহীন নহে। এই মত অনুসারে যে ব্যক্তি সবুজ বর্ণ বিষয়ে 'অন্ধ' তাহার ঐ বর্ণসম্বন্ধীয় 'পদার্থ' নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে সাদা

রঙ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইত না, কারণ সাদা রঙের উৎপত্তি ঘটে সকল প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণে।

(খ) হেরিং-এর মতবাদ (Hering's Theory of Vision) :

চাক্ষুয সংবেদন সম্বন্ধে হেরিং যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহার বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতরূপ :

(১) বর্ণ সংবেদন চারিটি বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে—লাল, সবুজ, হলুদ ও নীল। সাদা ও কালো সম্বন্ধে যে সংবেদন, তাহা বর্ণহীন সংবেদন (colourless sensation)। ইহাদের এক একটি জোড়ায় সাজান যায়—লাল-সবুজ, হলুদ-নীল, সাদা-কালো।

(২) প্রত্যেক জোড়া রঙের উদ্দীপনের উপযুক্ত একটি করিয়া আলোক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। প্রত্যেক পদার্থের দুইটি বিপরীত ধর্ম থাকে—একটি গঠন (anabolism বা assimilation), অপরটি অপচিতি (katabolism বা dissimilation)।

লাল, হলুদ এবং সাদা আলোকের প্রভাবে ঐ সব 'পদার্থের' অপচিতি ঘটে এবং সবুজ, নীল এবং কালো রঙের আলোকে উহাদের পুনর্গঠন ঘটে।

(৪) প্রত্যেক বর্ণের উপযুক্ত উদ্দীপক কেবল যে তাহার জন্ম নির্দিষ্ট 'পদার্থের' উপর ক্রিয়া করে তাহা নহে, উহা সাদা-কালোর জন্ম নির্দিষ্ট পদার্থের উপরও ক্রিয়া করে। এইজন্ম সকল বর্ণেরই অল্পবিস্তর ঔজ্জ্বল্য থাকে।

(৫) অক্ষিপটে বিভিন্ন বর্ণমণ্ডলের বিভাগ ঐ মণ্ডলে এক এক প্রকারের পদার্থের অস্তিত্ব অনুসারে হইয়াছে বলা যায়।

(৬) সর্বণ অনুবেদন (positive after-image)-এর কারণ হইল যে, কোন উদ্দীপকের উপর অনেকক্ষণ চক্ষুকে স্থির রাখার ফলে উহার রাসায়নিক পদার্থের পুনর্গঠন শক্তি অনেক পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়ে।

অপরপক্ষে অসর্বণ অনুবেদনের কারণ হইল নিম্নরূপ। যখন অক্ষিপটে উদ্দীপন ঘটে, তখন তিনটি পদার্থ নূতন সাম্যাবস্থা গ্রহণ করে। উদ্দীপন শেষ হইলে উহারা পুনরায় পূর্বের সাম্যাবস্থা গ্রহণ করে; উহাদের এই 'প্রত্যাবর্তন' কালে উহারা গুরুমস্তিষ্কে বিপরীত উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

ইহারই ফলে যে বর্ণ প্রথমে উদ্দীপনের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিপূরক বর্ণ দ্বারা উদ্দীপনের অল্পরূপ উদ্দীপন সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ অসবর্ণ অনুবেদন ঘটে।

(৭) বর্ণাঙ্কতা নিম্নলিখিতভাবে ঘটিয়া থাকে। যেখানে পূর্ণ বর্ণাঙ্কতা হয়, সেখানে কেবলমাত্র সাদা-কালোর উপযুক্ত পদার্থ অক্ষিপটে আছে। যেখানে লাল-সবুজ বর্ণযুগল সম্বন্ধে অঙ্কতা হয়, সেখানে ইহাদের উপযুক্ত পদার্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যেখানে নীল ও হলুদ বর্ণদ্বয় সম্বন্ধে অঙ্কতা হয়, সেখানে ইহাদের উপযুক্ত পদার্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(৮) পদার্থগুলি একটি একটি নূতন সাম্যাবস্থা গ্রহণ করার ফলে অভিযোজন (adaptation) ঘটে।

সমালোচনা :

হেরিং-এর মতবাদ ইয়ং-হেল্মহোলৎসের মতবাদ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। কিন্তু এই মতেরও কয়েকটি ত্রুটি আছে। কেবলমাত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়া—যথা, অপচিতি ও পুনর্গঠন—বর্ণসংবেদনের প্রধান কারণ, ইহা সকলে গ্রহণ করেন না। তাহা ছাড়া, হেরিং বর্ণ-সমুদয়ের যে শ্রেণীকরণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও আপত্তি উঠিতে পারে; কারণ সাদা ও কালো রঙ লাল-সবুজ এবং নীল-হলুদ রঙের সহিত ঠিক সমপর্যায়ভুক্ত নহে—যদি লাল-সবুজ বা নীল-হলুদের উপযুক্ত ‘পদার্থ’ সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে কোন বর্ণসংবেদন হইবে না, অথচ যদি সাদা-কালোর উপযুক্ত ‘পদার্থ’ সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে ধূসর বর্ণের সংবেদন হয়। আবার, বর্ণাঙ্কতার ক্ষেত্রে হেরিং-প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে যে, যে সকল ব্যক্তি লাল ও সবুজ দুইটি বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া কেবলমাত্র একটি বর্ণ (অর্থাৎ লাল, সবুজ, নীল, হলুদ এই চারিটির যে কোন একটি) সম্বন্ধে অন্ধ তাহাদের কোন্ ‘পদার্থ’ নষ্ট হইয়াছে? যদি কেহ লাল সম্বন্ধে অন্ধ হয়, তাহার কি লাল-সবুজের জন্ত নির্দিষ্ট পদার্থের মাত্র অর্ধাংশ নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে? নিশ্চয়ই এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে।

(গ) ফন্ ক্রীসের দ্বৈতবাদ (Duplex Theory of Von Kries) :

ফন্ ক্রীস বলেন যে, অক্ষিপটে বর্ণ-সংবেদন এবং বর্ণহীন সংবেদনের জন্ত

দুইটি পৃথক ব্যবস্থা আছে। বর্ণ-সংবেদনের কালে চূড়াকৃতি বা শঙ্কুকোষ-গুলি (cone cells) এবং বর্ণ-হীন সংবেদনের কালে দণ্ডকোষগুলি (rod cells) ক্রিয়াশীল হয়। উজ্জ্বল আলোকে বা দিবালোকে শঙ্কুকোষ (cone)-গুলি কার্য করে এবং অস্পষ্ট, নিম্নপ্রভ আলোকে বা সন্ধ্যার স্নান আলোক (twilight)-এ দণ্ডাকৃতি কোষগুলি কার্য করে। শঙ্কু বা চূড়াকৃতি কোষগুলি উদ্দীপিত হইলে বর্ণ-সংবেদন জন্মে ; অপরপক্ষে দণ্ডাকৃতি কোষগুলি কেবলমাত্র বর্ণহীন আলোছায়া সংবেদন (colourless বা light & shade sensation) জন্মায়। অক্ষিপটের কেন্দ্রবিন্দু বা ফোভিয়া (fovea)-তে কেবল শঙ্কুকোষ আছে এবং অক্ষিপটের প্রান্তদেশে কেবল দণ্ডাকৃতি কোষ আছে। এইজন্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বর্ণাহীন তাহার অক্ষিপটের কেন্দ্রবিন্দুস্থ চূড়াকৃতি কোষগুলি কোন কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে—তাহার ক্ষেত্রে কেবল দণ্ডাকৃতি কোষগুলি কার্য করিতেছে। পুরকিন্‌য়-আবিষ্কৃত ঘটনা কেবলমাত্র সন্ধ্যার স্নান আলোকে দেখা যায় ; অতএব ইহা প্রত্যক্ষ-কালে কেবলমাত্র দণ্ডাকৃতি কোষগুলি কার্য করে।

(ঘ) ল্যাড্-ফ্রাঙ্কলিনের মতবাদ (Ladd-Franklin's Theory) :

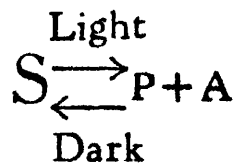
শ্রীমতী ল্যাড্-ফ্রাঙ্কলিন্ (Mrs. Ladd-Franklin) বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একটি বর্ণবাদ (colour theory) প্রচার করেন। তিনি মনে করেন যে, বর্তমানে মানুষের যে বর্ণ সংবেদনের ক্ষমতা আছে তাহা সে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে লাভ করিয়াছে। আদিম বা প্রাথমিক স্তরে যে সংবেদন ছিল তাহা বর্ণহীন ; অর্থাৎ বর্ণহীন সংবেদনের অবস্থা হইতে সর্ব-সংবেদনের অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে। অক্ষিপটের প্রান্তদেশে আজও সেই প্রাথমিক অবস্থা বিদ্যমান আছে ; সেইজন্য সেখানে কোন কিছুই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব পড়িলে বর্ণ-সংবেদন জন্মে না।

এই মত অনুসারে চূড়াকৃতি কোষ এবং দণ্ডাকৃতিকোষ উভয়েতেই একই প্রকারের আলোক-রাসায়নিক পদার্থ আছে। দণ্ডাকৃতি কোষগুলিতে এই ‘পদার্থ’ অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। কিন্তু কতকগুলি চূড়াকৃতি কোষে এই পদার্থের এইরূপ বিভাগ হইয়াছে যে, উহাদের মাধ্যমে হলুদ এবং নীল বর্ণের সংবেদন জন্মে। আরও পরবর্তী অবস্থায় কতকগুলি চূড়াকৃতি কোষের

মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয় যাহার ফলে লাল ও সবুজ রঙ প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা জন্মে। এইভাবে দুইটি পথায়ের মাধ্যমে ক্রমশঃ বর্ণসংবেদনের ক্ষমতার সৃষ্টি হইয়াছে।

(ঙ) হেক্ট-প্রবর্তিত মতবাদ (Hecht's Theory of Vision):

সাম্প্রতিক কালে চাক্ষুষ সংবেদন (বিশেষতঃ বর্ণ-সংবেদন) সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে, সেগুলি ফন্ ক্রীস-প্রবর্তিত মতবাদের আলোকেই গঠিত হইয়াছে। এই সব মতবাদের মধ্যে সেলিগ্ হেক্ট (Selig Hecht)-এর মত উল্লেখযোগ্য। অক্ষিপটে বর্ণহীন সংবেদন (achromatic sensation) এবং বর্ণ-সংবেদন (chromatic sensation)-এর জন্ত দুইটি পৃথক্ ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ দণ্ডাকৃতি কোষ বর্ণহীন সংবেদনের ক্ষেত্রে এবং চূড়াকৃতি কোষ বর্ণ-সংবেদনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়—এই মত তিনি গ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া, অক্ষিপটকে আলোকচিত্রগ্রহণ-যন্ত্র বা ‘ক্যামেরা’র ফিল্মের সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ প্রকার ফিল্মে একটি ছবি গ্রহণ করিলে উহা পুনরায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু অক্ষিপট প্রতিবার ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই পুনরায় ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। হেক্ট মনে করেন যে, অক্ষিপটে আলোক সংবেদনশীল যে পদার্থ (photosensitive substance) থাকে, তাহা আলোক দ্বারা উদ্দীপিত হইবামাত্র কয়েকটি গৌণ বা উপজাত পদার্থ (by-product)-এ বিভ্লিষ্ট (decomposed) হইয়া পড়ে এবং আলোক-উদ্দীপনের অভাব অর্থাৎ অন্ধকার হওয়া মাত্র উহারা পুনরায় সংশ্লিষ্ট (resynthesised) হয়। তাহার মতকে সান্কেতিক রূপ দান করিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে হেক্ট্ উহা ব্যক্ত করেন :



(এখানে ‘S’ অর্থে বৃষ্টিতে হইবে photosensitive substance বা আলোক-সংবেদনশীল পদার্থ এবং ‘P’ ও ‘A’ হইল ঐ পদার্থের বিশ্লেষণের ফলে প্রাপ্ত দুইটি উপজাত বা গৌণ পদার্থ। আলোক-উদ্দীপনের ফলে ‘S’-পদার্থটি ‘P’ এবং ‘A’-তে বিভ্লিষ্ট হয় এবং অন্ধকারে উহারা পুনঃ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ‘S’ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে)।

আমরা উপরে কয়েকটি প্রধান মতবাদের উল্লেখ করিলাম। ইহাদের কোনটিই চাক্ষুষ সংবেদন-সংক্রান্ত সকল ঘটনার স্ফুট ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তবে ইহারা চাক্ষুষ সংবেদন-সংক্রান্ত কতকগুলি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তথা আংশিক ব্যাখ্যা দেয়—এই দিক্ হইতে ইহাদের উপকারিতা আছে।^{৩৭}

১৩। সহসংবেদন (Synaesthesia) :

এক একটি বিশেষ প্রকারের উদ্দীপক দ্বারা এক একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হয়—ইহা হইল সাধারণ নিয়ম; কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, যেন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত আর এক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপিত হয়; ফলে এক ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনজনিত সংবেদনের সহিত অপর এক ইন্দ্রিয়োচিত সংবেদন দেখা দেয়—অর্থাৎ একটি ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনের ফলে একই সঙ্গে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর সংবেদন হয়। ইহাকে বলে সহসংবেদন (synaesthesia)। যেমন, কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, শব্দ শ্রবণ করিলে শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান ত' হয়ই; উপরন্তু ঐ শব্দকে রঙীন বলিয়াও জ্ঞান জন্মে। যেমন, এক ব্যক্তির ইংরাজী 'a' অক্ষর শুনিলে হলুদ রঙ এবং 'e' অক্ষর শুনিলে সবুজ রঙের সংবেদন হইত।^{৩৮} সেইরূপ কাহারও কাহারও রাসন সংবেদনের সহিত বর্ণসংবেদন হয় (যেমন, এক ব্যক্তি বলিত যে, তাহার নিকট লবণাক্তস্বাদ হইল লাল, অম্লস্বাদ হইল সবুজ এবং মিষ্টস্বাদ হইল নীল!) এইগুলি অস্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে। তবে কোন ধাতব বস্তুর সহিত আর একটি ধাতব বস্তুর ঘর্ষণ শুনিলে (যেমন, রাঁধিবার সময় খুস্তি দিয়া কড়া চাঁচার শব্দ শুনিলে) অনেকেরই সমগ্র শরীরে শিহরণ জাগে।

৩৭ তুলনীয় : "None of these theories can be said to be complete or to explain all the facts, but they are useful in summarising a number of diverse facts." (Wenger, Jones & Jones, *Physiological Psychology*, p. 225).

৩৮ Galton এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। তাহার রচিত *Inquiries into Human Faculty & its Development* দ্রষ্টব্য।

উনবিংশ অধ্যায়

প্রত্যক্ষ

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে সংবেদন আলোচনা কালে বলিয়াছিলাম যে, সংবেদনের প্রত্যয়টি একটি বিমূর্ত প্রত্যয় (abstract concept)। পৃথকভাবে কেবলমাত্র সংবেদনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের অবগতি জন্মে না—কারণ ইন্দ্রিয়সম্মিলিত ফলে সংবেদন হইবামাত্র উহাকে আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা (interpret) করি এবং উহার উপর নূতন অর্থ আরোপ করি। সংবেদনকে কেন্দ্র করিয়া এই যে অভিজ্ঞতা জন্মে ইহাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ।^১ এই প্রত্যক্ষের স্বরূপ নির্ধারণই বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১। প্রত্যক্ষের স্বরূপ (Nature of Perception) :

প্রত্যক্ষ বলিতে আমরা বুঝি আমাদের সম্মুখে বর্তমানে উপস্থিত আছে এমন কোন বস্তু বা প্রাণী বা ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। ইহার মূলে আছে ইন্দ্রিয়-উদ্বীপনজনিত সংবেদন এবং এই সংবেদনের ফলে জন্মে কোন কিছু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রতীতি।

(ক) ক্রিয়াবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষও এক প্রকার ক্রিয়া—ইহা হইল বাহ্য পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটিলে তাহাতে প্রতিক্রিয়া করা। বাহ্য পরিবেশ যদি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষজনিত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্ভব হইত না। যেমন, বাহ্য পরিবেশে কোন না কোন উত্তাপ (temperature) সর্বদাই আছে; কিন্তু উত্তাপের যখন পরিবর্তন ঘটে, তখন শৈত্য (cold) বা উত্তাপ (warmth) সম্বন্ধে অবগতি জন্মে। অর্থাৎ শৈত্য বা উত্তাপ সম্বন্ধে সংবেদন অনেক পরিমাণে আপেক্ষিক। সেইরূপ আলো বা অন্ধকার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষও আপেক্ষিক।

১ ‘প্রত্যক্ষ’-পদের ব্যাস-বাক্য হইল “অন্ধ্রোঃ সমীপম্” ; কিন্তু ব্যাপক অর্থে কেবল অন্ধি নহে যে কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান আসে তাহাই প্রত্যক্ষ-জনিত জ্ঞান।

(খ) আমরা আমাদের পরিবেশের সব কিছু প্রত্যক্ষ করি না ; কতকগুলি নির্বাচিত (selected) বিষয়-বস্তু প্রত্যক্ষ করি। প্রতি মুহূর্তেই নানাবিধ উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্দীপিত করিতেছে—ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে মন যেন বিশেষভাবে নির্বাচন করিয়া লইয়া সেইগুলির প্রতি মনোযোগ অর্পণ করে এবং তাহাদের বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করে। যেমন, রাস্তার পথ চলিতে চলিতে পথচারীর দৃষ্টি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হয়। হয়ত' উদ্দীপক হিসাবে এইগুলি নূতন বা উজ্জ্বল বা বৃহৎ, অথবা কোন কারণে প্রত্যক্ষকারীর ঐ সকল বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য বা আগ্রহ আছে। মোট কথা, মনোযোগের যে সকল কারণ পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে (পৃ: ৪৬০-৬৫), সেইগুলির কোনটি বর্তমান থাকিলেই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ সেইদিকে যেন ধাবিত হয়। আবার, মনোযোগের ফলে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হয়।

(গ) প্রত্যক্ষকারীর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র যেন পুনর্ব্যবস্থাপিত ও সুগঠিত (organized) হয়। যেমন, যে সকল বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, অথবা যেগুলি পরস্পরের নিকটবর্তী, অথবা যাহাদের মধ্যে প্রতিসাম্যতা (symmetry) আছে, সেগুলি সহজেই একত্রে পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ ঐগুলি এক একটি 'দল' (group) গঠন করে। (পৃ: ৫৮৩-৫৮৫)।

(ঘ) ইন্দ্রিয় মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের উপর একটি অর্থ (meaning) আরোপিত হয়। এই অর্থ কী হইবে, তাহা কতকাংশে নির্ভর করে ব্যক্তিগত প্রাক্তন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের উপর, সমাজ ও কৃষ্টির প্রভাবের উপর এবং মানসিক প্রস্তুতি (set), প্রতিভা (attitude) ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রথমে কোন একটি উদ্দীপন প্রদত্ত হয় এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই উপর নূতন ব্যাখ্যা (interpretation) আরোপিত হয়। এই ভাবে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু গঠিত হয়।

২। সংবেদন ও প্রত্যক্ষ (Sensation and Perception) :

যদিও আমাদের অভিজ্ঞতায় সংবেদন বলিয়া কোন কিছু পৃথক্ সম্বন্ধে

নাই, তাহা হইলেও আমরা অনুমানের সাহায্যে ইহার কল্পনা করিতে পারি। সেইজন্য প্রশ্ন উঠিতে পারে : সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের পার্থক্য কোথায় ?

এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের মূলগত পার্থক্য নাই—সংবেদনই ব্যাখ্যার ফলে প্রত্যক্ষে রূপান্তরিত হয়। তবে উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত আপেক্ষিক পার্থক্য আছে :

(ক) সংবেদন হইল সরল, প্রত্যক্ষ হইল জটিল। সংবেদন ব্যাখ্যাত অবস্থায় প্রত্যক্ষের রূপ ধারণ করে—সুতরাং সংবেদনের উপর আরও কিছু আরোপিত হইলে তবে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

(খ) প্রত্যক্ষকে পরিস্ফুট জ্ঞান বলা যায়, কিন্তু সংবেদনে স্পষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। সংবেদন হইল উদ্দীপকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ঠিক প্রথমাবস্থা।

(গ) সংবেদনকে বলা যাইতে পারে, বস্তুর গুণের সহিত পরিচিতির প্রথমাবস্থা ; যেমন, লালত্ব, গোলাকারত্ব ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল গুণের সহিত পরিচিতি ঘটিবামাত্র বস্তু সম্বন্ধে যখন ধারণা জন্মে, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষের পর্যায় বলা যায়।

(ঘ) সংবেদনের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, উহা হইল কোন বস্তুর গুণাবলী সত্তোমাত্র ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত (presented) হইয়াছে এইরূপ অবস্থা এবং প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যাহা উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সহিত আরও কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির আলোকে যুক্ত হইয়াছে।^২

বাস্তবিক পক্ষে, 'বিশুদ্ধ' সংবেদন (pure sensation)—অর্থাৎ যাহার উপর কোন ব্যাখ্যাই আরোপিত হয় নাই—সম্ভব নহে। কারণ যখনই কোন সংবেদন হয়, তখনই আমরা উহাকে কোন-না-কোন প্রকারে ব্যাখ্যা

২ এইজন্য Perception-কে presentative-representative process বলা হয়। যাহা সংবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, তাহাই হইল প্রদত্ত 'অংশ' (presentative element) এবং যাহা পুনরায় স্মৃতির মাধ্যমে জাগরিত হয় এবং প্রদত্ত অংশের উপর আরোপিত হয়, তাহাকে বলে আরোপিত বা পুনরুৎপাদিত 'অংশ' (representative element)। এইভাবে সংবেদনকে ব্যাখ্যা করা হয় বলিয়া অনেক সময় perception = sensation + interpretation এই সমীকরণ (equation) প্রদান করা হয়।

করিবার চেষ্টা করি; অর্থাৎ উহা কী তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি। সংবেদন হইবামাত্র উহা নিজেকে 'বিস্তৃত' করিবার চেষ্টা করে। যেমন, যদি ঈষৎ রক্তাভ, ঈষৎ হরিদ্রাভ গোলাকার একটি দ্রব্য দেখি, তখন কেবলমাত্র উহার বর্ণ বা আকার সম্বন্ধে পরিচিতি হইয়াই থামিয়া যায় না—উহা কোন্ বস্তুর বর্ণ ও আকার সে সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ প্রতীতি জন্মে। যেমন আলোচ্য ক্ষেত্রে এইরূপ সংবেদন হইবামাত্র হয়ত 'কমলালেবু' বলিয়া উহাকে চিনিতে পারি।

সুতরাং সাধারণ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংবেদন বলিয়া কোন অবস্থা থাকিতে পারে না। যদি বিস্তৃত সংবেদন বলিয়া কোন কিছু সম্ভব হয়, তাহা নবজাত শিশুর পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে।^৩ কারণ বয়োবৃদ্ধির সহিত যতই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইতে থাকে, ততই পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন উদ্দীপককে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হয়।

৩। প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুর সংগঠন (Construction of the Object of Perception) :

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমাদের কোন সুবিস্তৃত বা সুসংবদ্ধ 'বস্তু' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। যদিও আমরা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, তাহা হইলেও যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া বিশ্বাস করি (অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি), তাহা কেবলমাত্র বাহ্য জগতের বস্তুগত নহে—উহার সহিত আমাদের মনোগত কিছু ভাব বা ধারণা জড়িত হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রত্যক্ষগত জ্ঞান পুরাপুরি বস্তুগত নহে—ইহা কতকাংশে বস্তুগত আর কতকাংশে প্রত্যক্ষকারীর মনঃসম্ভ্রাত।^৪

১১৭ প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু গঠনে মন ঠিক কী অংশ গ্রহণ করে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিভিন্ন মনোবিৎ মনের বিভিন্ন অবদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

৩. ৩ কারণ নবজাত শিশুর চেতনা নিতান্ত অস্পষ্ট ও অব্যক্ত। এইরূপ চেতনাকে উইলিয়াম জেম্স "Booming, buzzing consciousness" বলিয়াছেন।

৪. জুলিনী : "In all cases the mind contributes something to the form of what it perceives...It is not only the physical character of the object which determines the pattern." (A. W. P. Walters, *The Evidence of Our Senses*, p. 25).

করিয়াছেন।^৫ আমরা এখানে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু রচনায় মনের কয়েকটি প্রধান অবদানের উল্লেখ করিব।

(ক) পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রভাব :

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের ফলে যে সংবেদন জন্মে, পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা উহাদের অনেকাংশে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। যেমন, দূর হইতে আমরা একটি দীপ্ত রক্তাভ, দীপ্ত হরিদ্রাভ বা সবুজ বর্ণাভ গোলাকার বস্তু দেখিলাম এবং উহাকে কমলালেবু বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। ইহার মূলে পূর্ব অভিজ্ঞতার অবদান রহিয়াছে। আমরা পূর্বে কমলালেবু অনেকবার খাইয়াছি, স্পর্শ করিয়াছি, উহার আত্মা লইয়াছি এবং তখন উহার রঙ, বা বর্ণ এবং আকার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন উহার বর্ণ ও আকার প্রত্যক্ষ করিবামাত্র উহাদের সহিত অনুযুক্ত পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগরিত হইয়া বর্তমান অভিজ্ঞতার সহিত ‘সংমিশ্রিত’ হইয়া প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু গঠনে অংশ গ্রহণ করিল। সুতরাং আমরা কেবলমাত্র আকার ও বর্ণ দেখিয়া উহাদের ‘আধার’-স্বরূপ বস্তুটি যে নরম, রসপূর্ণ, সুগন্ধযুক্ত ইত্যাদিও বুঝিতে পারিলাম এবং ইহাও প্রত্যক্ষের

৫. অবস্থাবাদীরা (যথা, ডুওট, টিচেনার ইত্যাদি) মনে করেন যে, প্রত্যক্ষ হইল একটি জটিল মানসিক অবস্থা—ইহার মূলে প্রধানতঃ সংবেদন ও প্রতিরূপ, এই দুই উপাদান আছে। ইহারা পৃথকভাবে অর্থ (meaning)-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করিয়া উপাদান নির্ণয় করিলেই উহার ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত হইবে।

ব্যবহারবাদীরা (যথা, ওয়াটসন) প্রত্যক্ষের পৃথক কোন আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রত্যক্ষ ও উহার অন্তর্ভুক্ত তথাকথিত ‘অর্থ’-এর আলোচনা কেবলমাত্র কাল্পনিক মানসিক সত্তায় আশ্রয়ান্বিত ব্যক্তিরা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা উহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

মনঃসমীক্ষণবাদীরা (যথা, ফ্রেড্) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন নাই। তবে নব্য ফ্রেডীয়রা ‘উদ্দেশ্য-প্রত্যক্ষ’ (goal-perception) এবং ‘আত্ম-প্রত্যক্ষ’ (self-perception)-এর কথা বলিয়াছেন।

ছরমিকবাদীরা (যথা, ম্যাকডুগাল) প্রত্যক্ষকে ক্রিয়াক্রমে গণ্য করেন এবং উহা যে মূলতঃ নির্বাচনী ক্রিয়া (selective activity), সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গেস্টাল্টবাদীরা (যথা, কফ্কা, কোয়েলার ইত্যাদি) প্রত্যক্ষের আলোচনায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সূচনা করেন; তাঁহারা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র কি ভাবে গঠিত হয়, তাহাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। (পৃ: ৫৮২)।

[প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদের আলোচনার জন্য F. H. Allport-প্রণীত *Theories of Perception & the Concept of Structure* দ্রষ্টব্য।]

অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হইল। বাস্তবিক যে সকল বস্তু বা যাহাদের সদৃশ বস্তু আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেগুলি প্রত্যক্ষ করার এবং তদনুসারে প্রতিক্রিয়া করার ব্যাপারে যেন একটি অভ্যাস জন্মিয়া যায় এবং উহাদের সম্বন্ধে কোন সংবেদন হইবামাত্র আমরা অভ্যাসবশে উহাদের বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করি।^৬

পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রভাবে বিষয়-বস্তুর আকৃতি আমরা ‘অপরিবর্তিত’ (constant) রূপে প্রত্যক্ষ করি। যখন প্রত্যক্ষের বস্তু আমাদের নিকট হইতে অল্প দূরে লইয়া যাওয়া হয়, অথবা আমরা উহা হইতে অল্প দূরে যাই, তখন অক্ষিপটে উহার প্রতিকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া যায় ; অথচ পুরাতন অভ্যাসের প্রভাবে উহাকে আমরা একইভাবে দেখি, অর্থাৎ উহার আকৃতি (size) আমাদের নিকট অপরিবর্তিত থাকে।

পুরাতন অভিজ্ঞতা যে কি ভাবে বর্তমানের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহার আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় জন্মান্তর ব্যক্তি যে সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে। জন্মের সময় কোন কারণে ‘ছানি’ ছিল এবং পরে তাহা অপসারিত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি যখন দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল, তখন দেখা গিয়াছে যে, সে তাহার পূর্বপরিচিত বস্তু বা ব্যক্তিকে কেবল চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়া ভাল চিনিতে পারিল না, অথচ স্পর্শ করিবার ফলে (যে রূপ প্রক্রিয়া সে অক্ষাবস্থায় গ্রহণ করিত) সে উহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিল।

বলা বাহুল্য, যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা বর্তমানের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেই হেতু পূর্ব অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীরও তারতম্য ঘটে।

(খ) পরিবেশ ও প্রসঙ্গের প্রভাব (Influence of environment and context) :

পরিবেশের তারতম্য আমাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তদনুসারে প্রত্যক্ষকারীর মনের দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য ঘটে। অসং প্রকৃতির

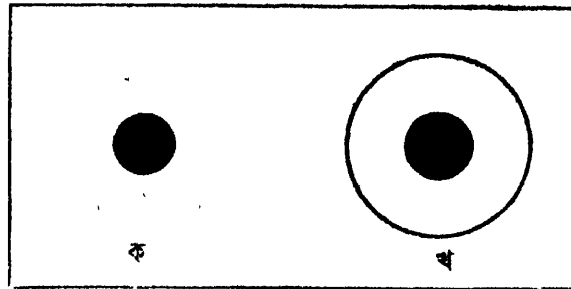
^৬ তুলনীয় : “With the few possible exceptions provided by primitive organizations, all perceiving is dependent upon past experience—the so-called *habis factor*.” (Munn, *Psychology*, p. 329).

লোকের সংসর্গে যদি আমরা একটি সংলোককেও দেখি, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমরা অনেক সময় তাহাকে অসং ব্যক্তিরূপেই ‘প্রত্যক্ষ’ করিব।

আবার যে প্রসঙ্গে কোন একটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা জানা থাকিলে তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হয়। যেমন, ৪৭৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ‘মজার ছবি’র ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে, তথাকথিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের পশ্চাতে কতকগুলি মানুষের মুখ লুকান রহিয়াছে; সুতরাং ছবিটি দেখিবামাত্র মুখগুলি বাহির করিবার চেষ্টা হয় এবং একবার দেখিলে পরে উহাদের উপর প্রায়ই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

(গ) ক্ষেত্র এবং মূর্তি প্রত্যক্ষ—সমগ্রীকরণের প্রচেষ্টা (গেস্টাল্ট-মতবাদ) :

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট-মতবাদের অবদান অপরিসীম। গেস্টাল্ট-বাদীরা অনুশঙ্গবাদের বিরোধিতা করেন এবং তাঁহারা বলেন যে, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সংবেদন এবং অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার সংযোগ নহে—প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর একটি সামগ্রিক রূপ আছে এবং ইহা তাহার অংশগুলির সংযোগের মধ্য পাওয়া যায় না। মোট কথা, প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর ‘সমগ্রত্ব’-এর একটি নিজস্ব সত্তা আছে। (পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য)।



১নং চিত্র।

ক্ষেত্র ও মূর্তির পার্থক্য অনুসারে দৃষ্ট-বস্তুর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন।

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে গেস্টাল্ট-বাদীদের মতের বৈশিষ্ট্য দুইটি :—(ক) আমরা যখনই কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন উহাকে ‘এক বিশেষ ক্ষেত্রের পরি-

প্রেক্ষিতে একটি মূর্তি' (a figure in relation to a ground) হিসাবে দেখি। এই ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটলে মূর্তিরও যেন পরিবর্তন ঘটে। ১নং ছবিতে দুইটি বৃত্ত দেখান হইয়াছে—উহারা দুইটিই একই আকারের। কিন্তু প্রথমটি হইতেছে কালো ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে একটি শাদা বৃত্ত এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে শাদা ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে একটি কালো বৃত্ত। কিন্তু ভূমির তারতম্যের জন্য বৃত্ত দুইটিকে বিভিন্ন রূপের মনে হইতেছে।

তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ-গোচর প্রতি বিষয়বস্তুকে একটি 'সমগ্র একক' ('one whole' বা 'unit') রূপে দেখিবার প্রতি প্রবণতা থাকে।

সে সকল বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য (similarity) আছে, তাহারা মিলিয়া একটি 'দল' গঠন করে; যেমন, ২ (ক) নং চিত্রে ত্রিভুজ, বৃত্ত এবং গুণচিহ্ন মিশাইয়া থাকিলেও ত্রিভুজগুলি, বৃত্তগুলি এবং গুণচিহ্নগুলি মিলিয়া তিনটি পৃথক্ দল গঠন করিয়াছে। ইহার ফলে হয় ত্রিভুজগুলির প্রতি, না হয় গুণচিহ্নগুলির প্রতি, আর না হয় বৃত্তগুলির প্রতি সংযুক্তভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

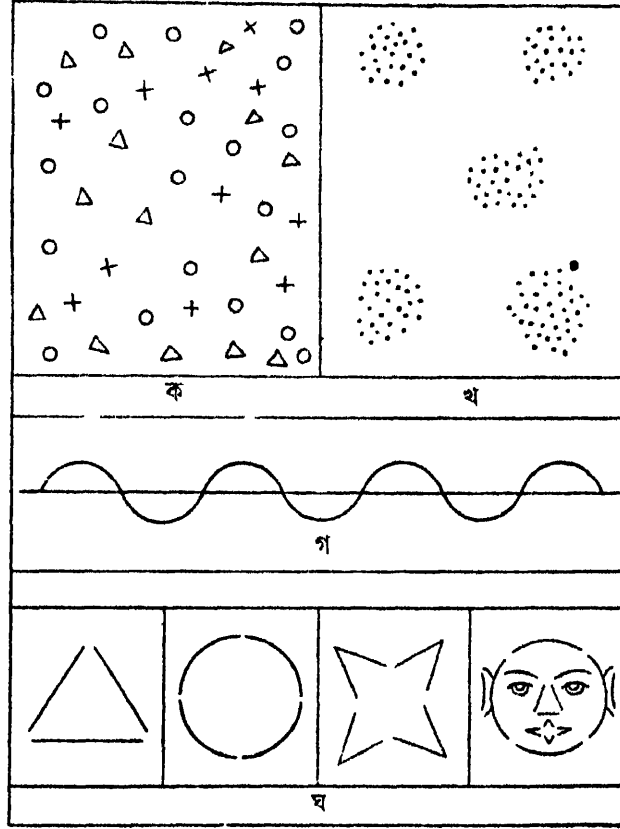
যে সকল বস্তুর মধ্যে নৈকট্য (proximity) আছে, তাহারা মিলিতভাবে একটি দল গঠন করে। যেমন ২ (খ) নং চিত্রে যে সকল বিন্দু পরস্পরের নিকটবর্তী আছে সেগুলি এক একটি পৃথক্ দল গঠন করিয়াছে।

প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি অবচ্ছেদ থাকে, তাহা হইলেও আমরা উহা অগ্রাহ করিয়া যাই এবং উহাকে একটি সমগ্র নিরবচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া দেখি। যেমন, ২ (গ) নং চিত্রে সরলরেখা ও বক্ররেখা পরস্পরকে কর্তন করিয়াছে, অথচ উভয়কেই নিরবচ্ছিন্ন মনে হইতেছে।

আবার যেখানে কোন অসম্পূর্ণতা আছে, সেখানে উহা অগ্রাহ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে বা যথাযথভাবে দেখিবার প্রবণতা আমাদের আছে। (ইহাকে বলা হয় Prägnanz বা preciseness)। আবার সেইজন্য যেখানে কোন কিছু মধ্য কোন ব্যবধান বা ফাঁক (gap) আছে, সেইখানে উহাকে অগ্রাহ করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মূর্তিরূপে দেখি (ইহাকে বলে 'gap filling' বা 'closure')।

২ (ঘ) নং চিত্রে অনেকগুলি অসম্পূর্ণ রূপরেখা দেখান হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটিকে বলিব ত্রিভুজ, দ্বিতীয়টিকে বৃত্ত, তৃতীয়টিকে তারকা এবং চতুর্থটিকে

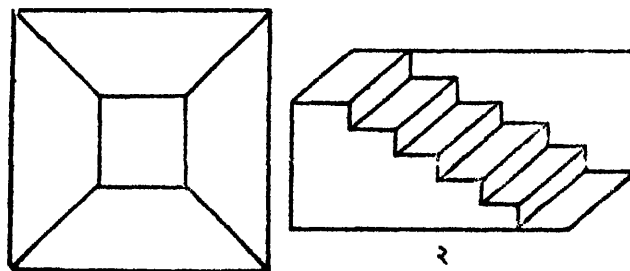
মানুষের মুখ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিটির বর্ণনাই ত্রুটিপূর্ণ—প্রতিটি মূর্তির মধ্যেই অসম্পূর্ণতা বা অবচ্ছিন্নতা আছে, অথচ আমরা উহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিটি মূর্তিকে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে চাই।



২ নং চিত্র।

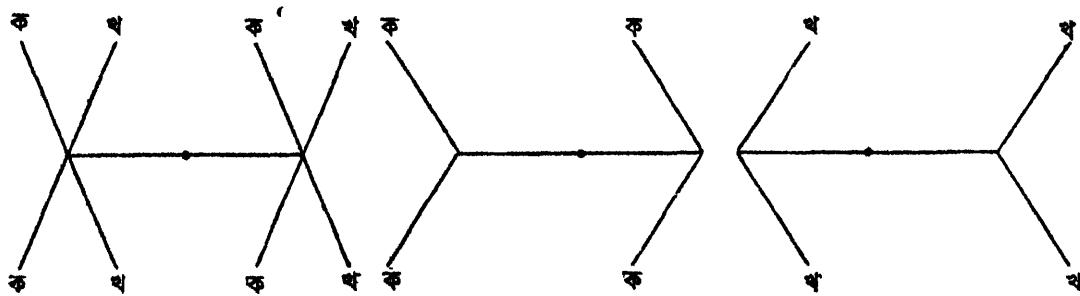
উপরের বিভিন্ন চিত্র গেস্টাল্ট্‌ মতবাদ অনুসারে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু কিভাবে গঠিত হয় তাহা ইঙ্গিত করিতেছে।

আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন উহাকে অনেক সময় পরিচিত বস্তুর অনুরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ করি। ৩ নং চিত্রটির প্রথম রেখাঙ্কনটি ঘরের ভিতরের ছবি এবং দ্বিতীয়টি সিঁড়ির ছবি বলা হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহাদের প্রত্যেকটিই বিশেষ ভঙ্গিমায় প্রদত্ত কয়েকটি রেখার সমাবেশ মাত্র।



৩ নং চিত্র।

আবার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অনুসারে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের বিকাশ বা সংঠন (organisation)-এর পরিবর্তন ঘটে। যেমন, নিম্নে (৪নং চিত্রে) একই দৈর্ঘ্যের প্রতীসাম্যবিশিষ্ট তিনটি সরলরেখা দেখান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যবিন্দু একই স্থানে ; কিন্তু যদি “খ” রেখাগুলি উঁহ করা যায়, তাহা হইলে মধ্যবিন্দু যেন ডানদিকে একটু সরিয়া গিয়াছে মনে হয় এবং যদি “ক” রেখাগুলি উঁহ করা যায়, তাহা হইলে মনে হয় যে, মধ্যবিন্দু যেন বামদিকে একটু সরিয়া গিয়াছে।



৪ নং চিত্র।

গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের পশ্চাতে প্রধান স্নায়ুতন্ত্রে (বিশেষতঃ গুরুমস্তিষ্কে) অন্তরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্দীপক ও স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়ে “প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র” গঠিত হয়। আমরা যখন উদ্দীপকের এক এক প্রকার রূপ (pattern) প্রত্যক্ষ করি, তখন গুরুমস্তিষ্কেও এক এক প্রকার পরিবর্তন (change in pattern) ঘটে এবং “প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র” (field of perception) গঠনে উহা বিশেষ অংশ গ্রহণ করে ¹।

[আমরা এই প্রসঙ্গে গেস্টাল্ট মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয় কয়েকটি নীতির উল্লেখ করিতে পারি² :

(১) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র সর্বদাই কোন-না-কোন ভাবে সুগঠিত ও সংঘবদ্ধ।

(২) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অংশগুলির বৈশিষ্ট্য ‘সমগ্র’-এর বৈশিষ্ট্য হইতে

¹ রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) হইতে isomorphism-এর উগমা গ্রহণ করিয়া গেস্টাল্টবাদীরা বলেন যে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের আকার-বৈচিত্র্যের তুল্য অবস্থা গুরুমস্তিষ্কে থাকে (ইহাকে ‘isomorph for brain action’ বলে)। তবে গেস্টাল্টবাদীরা এই মতের সপক্ষে বিশেষ প্রমাণ দেখান নাই। (W. Köhler, *Gestalt Psychology*, pp. 184-85 দ্রষ্টব্য।)

² R. H. Wheeler, *The Laws of Human Nature*, pp. 129-138 দ্রষ্টব্য।

উদ্ভূত। যেমন, একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুগুলি ত্রিভুজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহার তিনটি সরলরেখামাত্র।

(৩) ‘সমগ্রটি’ ইহার ‘অংশ’-গুলিকে নির্ধারণ করে; অর্থাৎ অংশগুলি কী প্রকারের হইবে, তাহা নির্ভর করে উহার কোন সমগ্র বস্তুর অংশ তাহার উপর। একই সরলরেখা ত্রিভুজের বাহু হইলে উহার এক অর্থ এবং চতুর্ভুজের অংশ হইলে উহার আর এক অর্থ।

(৪) প্রথমে কোন বস্তু একটি সমগ্র ‘একক’ ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং ধীরে ধীরে উহার অংশের প্রতি দৃষ্টি অর্পিত হয়। •

(৫) ‘সমগ্র’ বস্তুর যে ‘সমগ্রত্ব’ তাহা সমগ্র বস্তু হইতেই উদ্ভূত হয়, উহার অংশগুলি হইতে উহার ‘অর্থ’ উদ্ভূত হয় না। চারিটি সরলরেখা হইতে পৃথক পৃথক ভাবে চতুর্ভুজের অর্থ উদ্ভূত হয় না—উহার চতুর্ভুজের রূপ দান করিবার জন্য এক বিশেষভাবে মিলিত হইয়াছে বলিয়াই উহার চতুর্ভুজের বাহু।

(৬) যেখানে অসাম্যতা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি আছে, সেখানে ঐগুলি সাধারণতঃ অগ্রাহ্য করা হয়।

(৭) আবার ঐগুলি কেবল অগ্রাহ্য করাই হয় না, বরং প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে অসম্পূর্ণতা থাকে সেগুলিকে সাধারণতঃ পূরণ করা হয়।]

(ঘ) মানসিক প্রস্তুতি (Mental preparation বা set) :

পূর্ব হইতে যদি কোন মনোভাব গ্রহণ করা যায় এবং তদনুসারে যদি প্রত্যক্ষকারী নিজের মনকে ‘প্রস্তুত’ করে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের উপর উহার প্রভাব পড়ে। যদি কোন জ্যোতির্বিৎ (astronomer) পূর্ব হইতে এই ধারণা করিয়া ল’ন যে, মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ পৃথিবীর পরিবেশের অনুরূপ, তাহা হইলে তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহ প্রত্যক্ষ করিবার কালে ঐরূপ সাদৃশ্য যেন ‘অধিক’ দেখিতে পান।

(ঙ) প্রকোভ বা আবেগ বা কোন মানসিক উত্তেজনার প্রভাব :

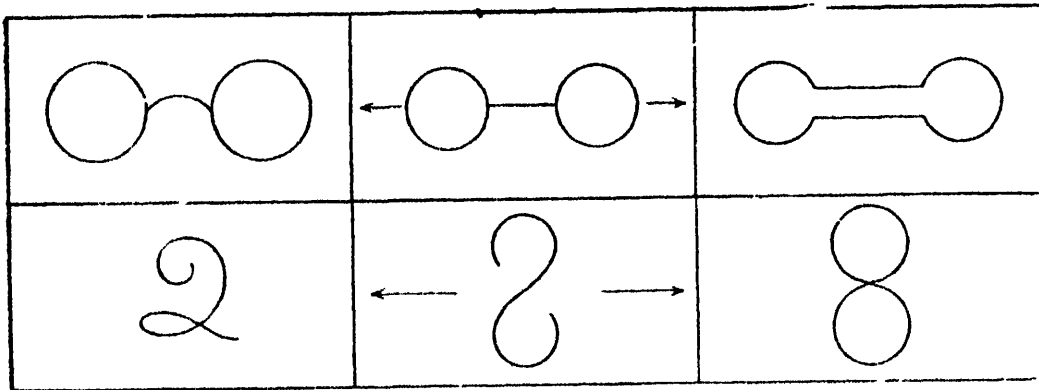
ক্রোধ, ভয় বা অন্য কোন মানসিক উত্তেজনার প্রভাবে আমরা প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু যথাযথভাবে দেখি না এবং তাহার উপর অবাস্তব বা অলীক গুণের অভিক্ষেপ (project) করি। সেইরূপ ভালবাসা ও ঘৃণাও^২

^২ তুলনীয় : “যারে দেখতে নারি, তা’র চলন বাঁকা”।

আমাদের প্রত্যক্ষকে বিভ্রান্ত করে; যেমন, স্নেহশীল মাতা তাঁহার পুত্রকন্যাদের অনেক অত্যাচার যেন দেখিতে পান না। সেইরূপ, উত্তেজনার সময় প্রত্যক্ষকারী যথাযথভাবে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যদি ‘প্রত্যক্ষদর্শী’ তিনজন ব্যক্তিকে একটি অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিতে বলা হয়, তাহা হইলে তিনজনের বর্ণনার মধ্যে পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে না।

(চ) অভিভাবনের প্রভাব (Influence of Suggestion) :

অভিভাবন (suggestion)-ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুকে রূপায়িত করে। প্রত্যক্ষকারীকে ‘বিষয়বস্তু’ প্রদানকালে উহাকে যেভাবে ‘বর্ণনা’ করা যায়, প্রত্যক্ষকারীও উহাকে অনেকসময় সেইভাবে দেখিয়া থাকে।^{১০} এই বিষয়ে একটি পরীক্ষণ করা যায়। এনং চিত্রের মধ্যস্থলে:



এ নং চিত্র।

উপরের চিত্রে প্রত্যক্ষের উপর অভিভাবনের প্রভাব ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মধ্যস্থলে ‘উদ্দীপক-বস্তু’ (stimulus object) দেখান হইয়াছে। উপরের ছবিটির ক্ষেত্রে একজনকে বলা হইয়াছিল যে উহা ‘চশমা’ এবং আর একজনকে বলা হইল যে উহা ‘ডায়েল’। প্রত্যেক পরীক্ষণ-পাত্র অভিভাবনের প্রভাবে ‘উদ্দীপক বস্তু’-কে ঐ ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং স্মৃতি হইতে তাহার উদ্দীপক-বস্তুকে ঐ ভাবেই আঁকিয়াছিল। (যথাক্রমে বাম ও ডান দিকের ছবি দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ নিম্নের ছবিটির ক্ষেত্রে উদ্দীপক দেখিয়া অভিভাবনের প্রভাবে একজন ইংরাজি ‘২’ এবং আর-একজন ‘৮’ রূপে উহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

[Carmichael, Hogan এবং Walter কর্তৃক পরিকল্পিত। *Jr of Exp Psy.*, Vol. 15 দ্রষ্টব্য।]

১০. গল্পে আছে যে, একবার এক সরলমনা লোক এক ছাগশিশু লইয়া যাইতেছিলেন। উহা দেখিয়া কয়েকজন দুষ্ট-বুদ্ধি লোকের লোভ হইল এবং তাহার বড়বস্ত্র করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি কেন কুকুর লইয়া যাইতেছেন। বার বার ঐরূপ শুনিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার গরু জীবটি বুঝি সত্যি কুকুর।

প্রকৃত উদ্দীপক (stimulus object) দেখান হইয়াছে। দুইজন পরীক্ষণ-পাত্রের নিকট উহাকে দুইভাবে বর্ণনা করা হইল এবং তাহাদের প্রত্যেককে সে যে ছবি দেখিয়াছে তাহা স্মৃতি হইতে আঁকিতে বলা হইল—দেখা গেল যে, যাহাকে যেরূপভাবে উদ্দীপকের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল, সে সেই অনুসারে পূর্বদৃষ্ট ছবিকে আঁকিল।

(ছ) সজ্জ ও সমাজের প্রভাব :

আমরা সকলেই এক একটি সজ্জ বা দল (group)-এর অন্তর্ভুক্ত ; আবার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বলিতে হয় যে, আমরা সকলেই এক একটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সজ্জ তথা সমাজ-এর আচার-ব্যবহার, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী উহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-বিশেষের প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে। যেমন, পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাবে যে ব্যক্তি লালিত-পালিত হইয়াছে, সে প্রাচ্যের অনেক আচার-ব্যবহারকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করিবে (অর্থাৎ উহাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিবে), প্রাচ্য সমাজের লোকেরা সেইভাবে করিবে না। আবার, ক্ষুদ্র দল বা সজ্জও প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে ; যেমন, কোন কারখানায় ধর্মঘট চলিতেছে—উহার প্রবেশমুখে ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের অল্প শ্রমিকরা যে ভাবে দেখিবে, মালিকশ্রেণীভুক্ত লোকেরা সেইভাবে দেখিবে না। শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত কোন লোক ধর্মঘটকারীদের কার্যকে ‘মেহনতী মানুষের জাত্য দাবীর সংগ্রাম’ রূপে ‘প্রত্যক্ষ’ করিবে, আর মালিক শ্রেণীভুক্ত অপর কোন লোক উহাকে ‘অজ্ঞ, অশিক্ষিত লোকের স্বার্থবিরোধী কার্য’ রূপে ‘প্রত্যক্ষ’ করিবে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া দাবী করি, তাহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত নহে। উদ্দীপক হইল বাস্তব অংশ, কিন্তু উহাকে পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে—উদ্দীপক ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগমাত্র উহার উপর নানা প্রভাব . তথা ব্যাখ্যা আসিয়া পড়ে এবং দু’য়ের সমন্বয়ে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু গঠিত হয়।

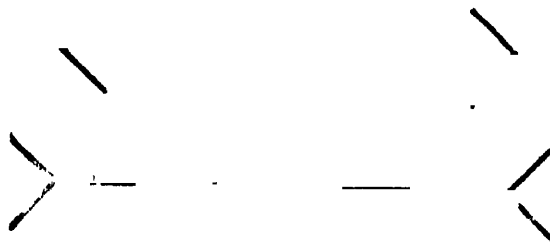
৪। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ও অমূল প্রত্যক্ষ (Illusion & Hallucination) :

মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শুদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা ভ্রান্তির

পার্থক্য নাই। আমরা যাহাকে ভ্রান্তি বলি, তাহারও মূলে কোন না কোন বাস্তব উদ্দীপক আছে; কিন্তু কোন কারণবশতঃ উহার উপর এমনই ব্যাখ্যা বা অর্থ আরোপিত বা অধ্যস্ত হইয়াছে যে, তাহার প্রকৃত রূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই আবরণ ও বিক্ষেপের প্রশ্ন উঠে যখন আমরা উহার যথার্থ্য বা সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে যাই। ইহা হইল মূলতঃ দর্শনের বিচার্য বিষয়।

মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ; তবে ইহাকে ভ্রান্ত আখ্যা দিবার কারণ এই যে, ইহার মাধ্যমে যে ‘জ্ঞান’ পাওয়া যায় তাহার সহিত বাস্তবতার অত্যাগ ‘মান’ (standard)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের বিরোধ আছে এবং ঐ জ্ঞান অনুসারে কার্য করিতে যাইলে ব্যর্থতা দেখা দিবে। অন্ধকারে বা অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুতে সর্পভ্রম বা সমুদ্রতীরে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে শুক্লিতে রজতভ্রম ভ্রান্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভ্রান্তি নানা কারণে ঘটিতে পারে; যথা, পুরাতন অভ্যাসের ফলে, অতীত মনোযোগ থাকার জন্ত, প্রতীক্ষা-সজ্জাত মনোযোগের জন্ত, ইন্দ্রিয়ের ত্রুটির জন্ত ইত্যাদি।^{১১}

বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমায় অঙ্কিত জ্যামিতিক রেখাঙ্কন অনেক সময় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সৃষ্টি করে। এবিষয়ে **মুয়েলার-লায়ার (Müller-Lyer)-** প্রদত্ত উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য (৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। নিম্নের চিত্রের



৬নং চিত্র।

মুয়েলার-লায়ার প্রদর্শিত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের উদাহরণ।

দুইটি সরল রেখার দৈর্ঘ্য একই ; অথচ প্রথমটিকে দ্বিতীয় অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা ছোট বলিয়া বোধ হয়।^{১২}

এই ভ্রান্তির কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যখনই আমরা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখনই উহাকে ‘সমগ্র একক’ (unified whole)-রূপে দেখি—উহাকে উহার ‘অংশ’ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে পারি না।^{১৩} এক্ষেত্রে প্রথম রেখাটির দুই পার্শ্বস্থ রেখাগুলি যেন বন্ধনীর ইঙ্গিত করিতেছে ; সেইজন্য দৃষ্টি সীমিত থাকিতেছে। অথচ দ্বিতীয় রেখাটির পার্শ্বস্থ রেখাগুলি ঐরূপ বন্ধনের কোন নির্দেশ দিতেছে না এবং দৃষ্টি দুই পার্শ্বে সীমিত না থাকিয়া উহা যেন ব্যাপকতর হইতে পারিতেছে।^{১৪} যাহা হউক, ইহা হইতে দুইটি বিষয় প্রমাণিত হয় : (ক) এইরূপ ভ্রান্তির জন্ম চক্ষুরিন্দ্রিয় বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দায়ী নহে ; (খ) আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবজগতের প্রতিচ্ছবি নহে—উহার মধ্যে মনের অবদানও যথেষ্ট আছে।

মুয়েলার-লায়ার ব্যতীত আরও অনেকে জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্বন্ধে চাক্ষুষ ভ্রান্তি (Geometrical optical illusions)-এর উদাহরণ দিয়াছেন (পর পৃষ্ঠায় ৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

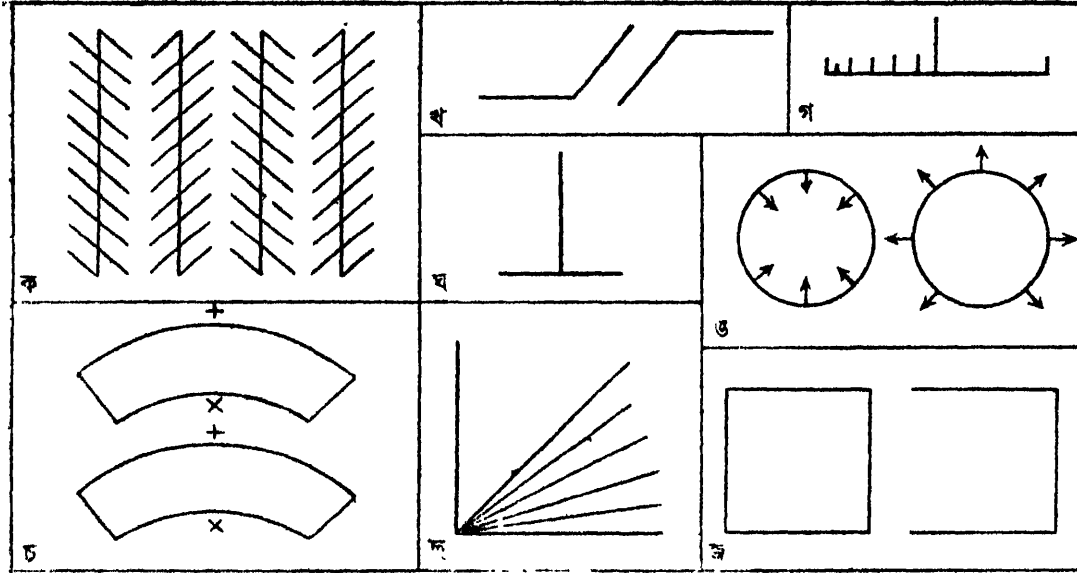
অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination)-এর ক্ষেত্রে বাস্তব কোন ভিত্তি নাই ; অথচ যেন কোন কিছু প্রত্যক্ষগোচর হয় বলিয়া ভ্রম জন্মে। সাধারণতঃ মত্তপান ইত্যাদির ফলে অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এবং মানসিক রোগগ্রস্ত অস্বভাবী ব্যক্তি (mentally ill বা abnormal person)-এর ক্ষেত্রে এইরূপ অমূল প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে (যেমন, চিত্তভ্রংশী বাতুল বা schizophranic ব্যক্তির প্রায়ই অমূল প্রত্যক্ষ করেন)। অমূল প্রত্যক্ষের প্রকৃত কারণ রহস্যবৃত।

১২ এই প্রকার ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ সাধারণ ভ্রমের স্তায় নহে। প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে ভ্রম দূর হয়। কিন্তু এখানে মাপকাঠি দ্বারা সমান্তরাল রেখা দুইটি মাপিয়া দেখিবার পরও ‘ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ’ থাকিয়া যায়।

১৩ ‘সমগ্র’ ও ‘অংশের’ পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে কেহ কেহ ‘confluence’ আখ্যা দিয়াছেন।

১৪ যদি সমান্তরাল রেখা দুইটি অঙ্ক রঙে (যেমন একটি লাল, আর একটি নীল কালিতে) আঁকা যায়, তাহা হইলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

হুতরাং ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সহিত অমূল প্রত্যক্ষের পার্থক্য এই যে, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের পশ্চাতে বাস্তব কোন উদ্দোপক থাকে, কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উহা থাকে না।



৭নং চিত্র।

উপরের চিত্রে বিভিন্ন প্রকারের রেখাঙ্কন ক্ষেত্রে যে সকল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে।

ক—লম্বরেখাগুলি সমান্তরাল; অথচ মনে হইতেছে যে, ইহারা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে।
খ—দুইটি কোণই সমান; অথচ মনে হইতেছে যে, কোণ দুইটি যেন অসমান। গ—একটি সরলরেখাকে বিখণ্ডিত করা হইয়াছে; অথচ বাম দিকের অর্ধাংশকে পুনরায় খণ্ডিত করার জন্ত উহাকে অপেক্ষাকৃত বড় মনে হইতেছে। ঘ—দুইটি রেখা দৈর্ঘ্যে সমান। অথচ লম্ব রেখাটিকে শয়ান রেখা অপেক্ষা বড় মনে হইতেছে। ঙ—দুইটি বৃত্তেরই পরিধি সমান; অথচ প্রথম বৃত্তটিকে দ্বিতীয় অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বোধ হইতেছে। চ—দুইটি মূর্তি একই আকারের; অথচ + চিহ্নিত রেখাগুলি পরস্পর অসমান এবং x চিহ্নিত রেখাগুলি অসমান বোধ হইতেছে। ছ—একটি কোণকে সমবিখণ্ডিত করা হইয়াছে; কিন্তু যেটিকে পুনরায় খণ্ডিত করা হইয়াছে, সেটিকে অপেক্ষাকৃত বড় বোধ হইতেছে। জ—যেটি অসম্পূর্ণ চতুর্ভুজ সেটি যেন সম্পূর্ণ চতুর্ভুজ অপেক্ষা বড় বোধ হইতেছে; অথচ উভয়ই সমান।

একটি উদাহরণের সাহায্যে যথার্থ প্রত্যক্ষ (correct perception), ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (illusion বা erroneous perception) এবং অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination)-এর পার্থক্য বুঝা যাইতে পারে। মনে করা যাউক, প্রত্যক্ষকারীর কিছু দূরে অন্ধকারে একটি গাছের শাখা হইতে কাপড় ঝুলিতেছে। প্রত্যক্ষকারী যদি কাপড়কে কাপড় বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে উহা হইবে যথার্থ বা শুদ্ধ প্রত্যক্ষ; কিন্তু যদি উহাকে বস্ত্র-পরিহিত

মহুগুমূর্তি মনে হয়, তাহা হইলে উহা হইবে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। আবার গাছও নাই, কাপড়ও নাই—ফাঁকা মাঠে যদি অবাস্তব একটি মহুগুমূর্তি কেহ প্রত্যক্ষ করে, তাহা হইলে উহা হইবে অমূল প্রত্যক্ষ।^{১৫}

৫। গৌণ প্রত্যক্ষ (Indirect or Acquired Perception) :

এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি বিশেষ প্রকারের জ্ঞান দান করে—যেমন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বস্তু-বিশেষের বর্ণ, আকার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়; শ্রাবণ প্রত্যক্ষ গন্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়; চর্ম্ম প্রত্যক্ষ বস্তুর শৈত্য, উত্তাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন হয় যে, যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান সাধারণতঃ পাওয়া যায়, তাহার মাধ্যমে উহা না পাইয়া অন্য কোন ইন্দ্রিয় উদ্দীপনের ফলে ঐরূপ জ্ঞান জন্মে; ইহাকে বলে গৌণ প্রত্যক্ষ। যেমন, আমরা কেবল চক্ষু দ্বারা ধূমায়মান চা দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, উহা গরম; এবং বাষ্প উঠিতেছে এরূপ বরফ দেখিয়াই বুঝিতে পারি যে, উহা ঠাণ্ডা। অথচ, চক্ষু উষ্ণতা বা শৈত্য সংবেদনের জন্ত নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় নহে; উহার নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় হইল শ্রবণ। সেইরূপ দূর হইতে কেবল চক্ষু দ্বারা এক খণ্ড চন্দনকাষ্ঠ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা সুগন্ধি।^{১৬}

সেইরূপ আমরা চক্ষু দ্বারা দূরত্ব, ঘনত্ব ইত্যাদি বিষয় জানিতে পারি। অথচ এইগুলি মুখ্যতঃ স্পর্শন ও পেশীজ সংবেদনের ফলে সরাসরি জানিতে পারা যায়। সুতরাং এইগুলি সবই হইল গৌণ প্রত্যক্ষ।

৬। দূরত্ব প্রত্যক্ষ (Perception of Distance) :

দূরত্বকে মুখ্যতঃ বা সরাসরি (directly) স্পর্শন ও পেশীজ প্রত্যক্ষ

১৫ শেক্সপীয়রের *Macbeth*-নাটকে অলীক ছুরিকা 'প্রত্যক্ষ' কালে ম্যাক্বেথের উক্তি লক্ষণীয় :

'Is this a dagger which I see before me,
The handle toward my hand ?
Come, let me clutch thee :—
I have thee not, and yet, I see thee still."

(*Macbeth*, Act II, Scene I).

১৬ জ্ঞানদর্শনের ভাষায় ইহাকে 'জ্ঞানলক্ষণ-প্রত্যক্ষ' বলে।

দ্বারা জানা যায়। চর্ম সংবেদনের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার দেশাভিজ্ঞানের ক্ষমতা আছে। ইহার ফলে, চর্মের কোন্ স্থান উদ্দীপিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। (পৃ: ৫২৮-২৯ দ্রষ্টব্য)। যদি আমরা কোন বস্তু হস্ত বা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইলে চর্মের অনেকগুলি স্পর্শবিন্দু উদ্দীপিত হয় এবং তাহার ফলে বুঝা যায় যে, উহা কতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে। বস্তুর আয়তন যেখানে ক্ষুদ্র, সেখানে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই উহা বুঝা যায়। ইহাকে ‘নিষ্ক্রিয় বা গতিহীন স্পর্শ’ (passive touch) বলা যায়।^{১৭} আবার, যদি বস্তুর আয়তন বা বিস্তার বেশী হয়, তাহা হইলে আমরা উহার বিভিন্ন বিন্দু ক্রমিকভাবে স্পর্শ করিয়া বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া অবস্থিত বিন্দুগুলির পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠি। অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া আলো জালিবার পূর্বে আমরা ঘরে অবস্থিত কোন বস্তুর (যথা, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির) বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া উহার বিস্তার সম্বন্ধে সচেতন হই। অন্ধলোক কেবলমাত্র হস্ত বা হস্তস্থ যষ্টি দ্বারা বিভিন্ন বিন্দু স্পর্শ করিয়া বস্তুর বা স্থানের বিস্তার নির্ণয় করিতে পারে। ইহাকে ‘সক্রিয় স্পর্শ’ (active touch) বলা হয়। তাহা ছাড়া, আমরা যখন এক স্থান হইতে অপর স্থানে হাঁটিয়া যাই, তখন পদযুগলের সহিত সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহ চালনার দ্বারাও আমরা ঐ দুই স্থানের অন্তর্বর্তী দূরত্ব সম্বন্ধে অবগত নই। যদি দূরত্ব অল্প হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ পেশী চালনার প্রয়োজন হয়, দূরত্ব অধিক হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পেশী চালনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং পেশীজ সংবেদনের তারতম্য হইতেও আমাদের দেশাভিজ্ঞান বা দূরত্ব, স্থান বা বিস্তার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

অতএব, বলা যাইতে পারে যে, স্থান, বিস্তার ও দূরত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা স্পর্শন ও পেশীজ সংবেদন (tactuo-muscular sensation)-এর মাধ্যমে সরাসরি (directly) জানা যায়।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা দূরত্ব অবধারণ (Knowledge of Space through Visual Perception) :

আমরা যে কেবল স্পর্শন ও পেশীজ সংবেদনের সাহায্যে দূরত্ব নির্ণয়

১৭ অবশ্য সম্পূর্ণ গতিহীন স্পর্শ প্রায় অসম্ভব বলা যাইতে পারে।

করিতে পারি তাহা নহে—চক্ষুর সাহায্যেও দূরত্ব বুঝিতে পারি। অতএব চাক্ষুষ সংবেদন দেশাভিজ্ঞান বা স্থান ও দূরত্ব সম্বন্ধে এবং ঘন বস্তু (solid object) সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। বলা বাহুল্য, চাক্ষুষ সংবেদনের মাধ্যমে দূরত্ব এবং ঘনত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা গোণ (indirect knowledge)। চক্ষু সরাসরি ভাবে এই জ্ঞান পায় না, কারণ নিশ্চয়ই চক্ষুর্দ্বয় স্ব স্ব অক্ষিগোলক হইতে বাহির হইয়া দূরত্ব মাপিয়া আবার ফিরিয়া আসে না! চক্ষু দ্বারা আমরা কতকগুলি ‘প্রতীক’ (signs বা clues) লক্ষ্য করি এবং ইহাদের মাধ্যমে গোণভাবে দূরত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মে। দার্শনিক বার্কলে (Berkeley) এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।^{১৮}

আমরা যখন স্পর্শ ও পেশীয় বেদন দ্বারা কোন বস্তুর দূরত্ব সরাসরিভাবে জানিতে পারি, তখন চক্ষু দ্বারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবলোকন করি। পরে যখন কেবলমাত্র ঐ সকল বৈশিষ্ট্য চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তখন উহাদের মাধ্যমে (অর্থাৎ গোণভাবে বা indirectly) দূরত্ব বুঝিতে পারি। সুতরাং ঐ সকল বৈশিষ্ট্য ‘দূরত্ব-নির্দেশক চাক্ষুষ চিহ্ন বা প্রতীক’ (visual signs, symbols বা clues) রূপে কার্য করে, অর্থাৎ ঐগুলি দেখিয়াই দূরত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মে।

আমরা এখানে কতকগুলি প্রধান প্রধান চাক্ষুষ প্রতীকের উল্লেখ করিতে পারি (৫২৭ পৃষ্ঠায় ৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য) :

(ক) বস্তুর আকারের আপাত পরিবর্তন—আমরা যখন কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে দেখি যে, কোন গতিশীল বস্তু ধীরে ধীরে ছোট হইয়া যাইতেছে, তখন বুঝিতে পারি যে, উহা দূরে চলিয়া যাইতেছে (যেমন, উড্ডীয়মান একটি যুড়ি ক্রমশঃ ছোট হইয়া যাইলে আমরা বুঝি উহা দূরে যাইতেছে ; আবার যখন দেখি যে, একটি গতিশীল ‘ছোট’ বস্তু ধীরে ধীরে ‘বড়’ হইয়া যাইতেছে, তখন বুঝিতে পারি যে, উহা নিকটে আসিতেছে। [৮ (ক) ছবি দ্রষ্টব্য।]

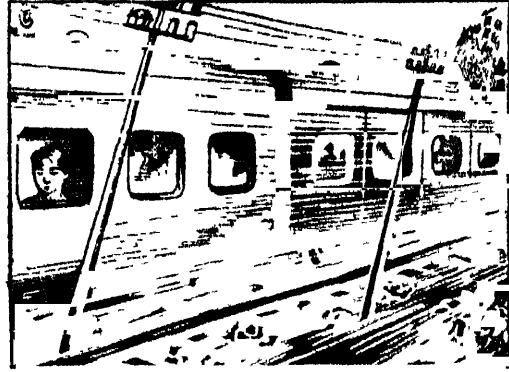
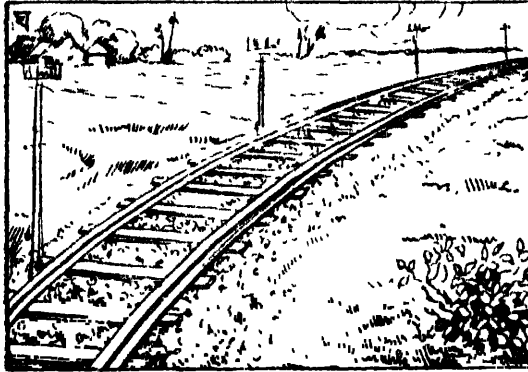
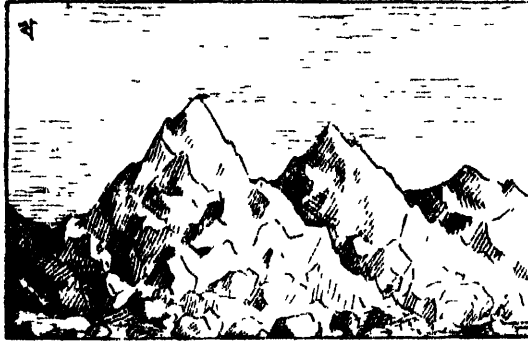
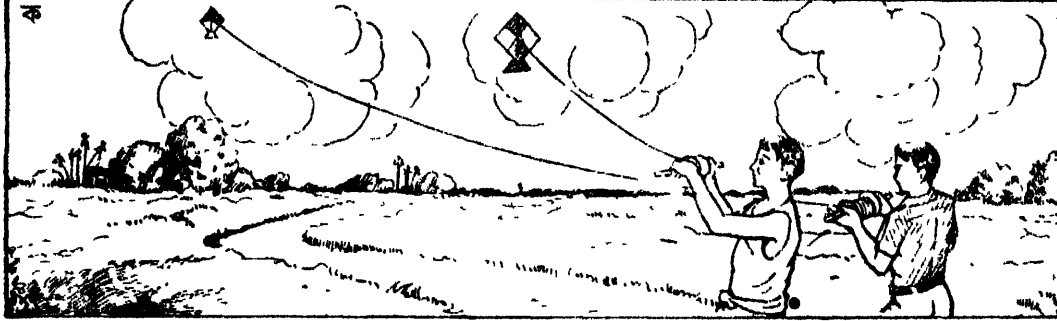
(খ) **উপস্থাপন (Interposition)**—একটি বস্তুর সম্মুখে যদি আর একটি বস্তু উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে যেটি সম্মুখবর্তী থাকে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় এবং যেটি পশ্চাতে থাকে, তাহার কিছু অংশ দেখা যায় না। সুতরাং যদি পরস্পরের পশ্চাত্বর্তী দুই বা ততোধিক বস্তুর সম্মুখে দাঁড়ান যায়, তাহা হইলে যেটিকে পূর্ণভাবে দেখা যায়, সেটিকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এবং যেটির প্রতিকৃতি ব্যাহত (obstructed) হয়, সেটিকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়। [৮ (খ) ছবি দ্রষ্টব্য।]

(গ) **আকাশ ও ভূমির আপাত মিলন**—আকাশ পৃথিবীর সহিত মিশিতে পারে না; কিন্তু কোন ফাঁকা মাঠে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন দূরদিগন্তে আকাশ আসিয়া মাটিতে মিশিয়াছে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই আপাত মিলনস্থল বিশেষ দূরবর্তী। সুতরাং যেখানে এইরূপ মনে হয়, সেই স্থানটি খুবই দূরে প্রত্যক্ষকারীর এইরূপ প্রতীতি জন্মে। [৮ (গ) ছবি দ্রষ্টব্য।]

(ঘ) **সমান্তরাল রেখার আপাত মিলন**—প্রকৃত সমান্তরাল (parallel) দুইটি রেখা কখনই পরস্পরের সহিত মিশিতে পারে না; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ ‘মিলন’ সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যেমন, রেলপথে লাইনের নিকট দাঁড়াইলে মনে হয় যে, কিছু দূরে যেন লাইন দুইটি মিলিত হইয়াছে; আবার সেখানে যাইলে দেখা যাইবে যে, সেখানে তাহারা মিলিত হয় নাই, তবে আরও কিছুদূরে যেন মিলিত হইয়াছে। পুরাতন অভিজ্ঞতার দেখা গিয়াছে যে, প্রতিটি আপাত মিলনস্থলই যথেষ্ট দূরবর্তী। সুতরাং ঐরূপ ‘মিলনস্থল’ দেখিলেই স্থানটি দূরবর্তী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। [৮ (ঘ) ছবি দ্রষ্টব্য।]

(ঙ) **স্থিতি বা আকার বৈলক্ষণ্য (parallax)**—যদি কোন দ্রুতগামী গাড়ীতে বসিয়া বাহিরের দিকে দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয় যে, যেগুলি নিকটবর্তী সেগুলি যেন গাড়ী যেদিকে ছুটিতেছে তাহার বিপরীত দিকে দৌড়াইতেছে এবং যেগুলি অতি দূরবর্তী সেগুলি যেন গাড়ী যেদিকে যাইতেছে সেইদিকে ধীরে ধীরে চলিতেছে। সুতরাং চলমান যান হইতে স্থিতিশীল বস্তুসমূহের আপাত গতির দিক বিচার করিলে উহার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সে সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। [৮ (ঙ) ছবি দ্রষ্টব্য।]

(চ) আলো ও ছায়া—আমরা সাধারণতঃ ধরিয়া লই যে, কোন বস্তুর সম্মুখভাগের উপর আলো পড়িতেছে এবং উহার পশ্চাদ্ভাগে অংশে ছায়া।



৮নং চিত্রে।

উপরের ছবিগুলি দূরত্ব-নির্ধারক বিবিধ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ইঙ্গিত করিতেছে।
পড়িতেছে। সুতরাং যেখানে ‘আলো ছায়া’র খেলা আছে, সেখানে আলোকোজ্জ্বল অংশটি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে।

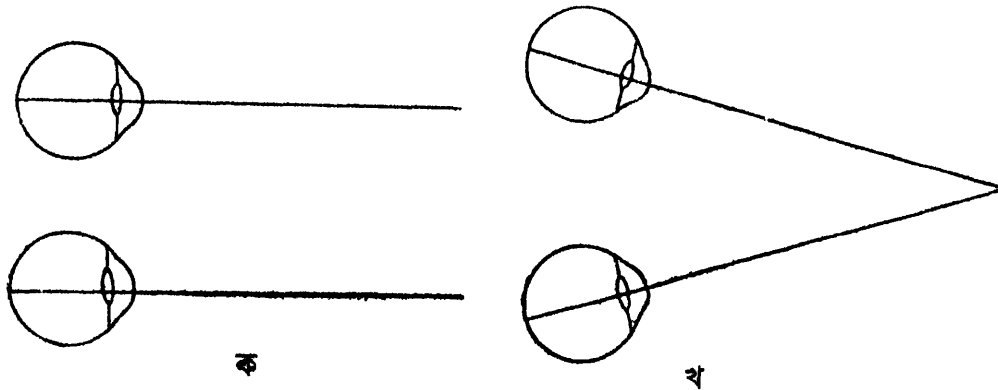
(ছ) স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা—নিকটবর্তী বস্তু স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় এবং দূরবর্তী বস্তু অস্পষ্ট দেখা যায়। সুতরাং স্পষ্টতা-অস্পষ্টতার মাধ্যমেও আমরা দূরত্ব বুঝিতে পারি।

(জ) চক্ষুর ‘কাচ’ বা লেন্সের অভিযোজন (Accommodation of lens)—নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত প্রতি চক্ষুর লেন্সে এমনভাবে

অভিযোজন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে বস্তুর প্রতিকৃতি ঠিক স্পষ্টভাবে লেন্সের উপর পড়ে। এইজন্য লেন্সকে একটু উত্তল (convex) করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রভাবেও বস্তুর নৈকট্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

(খ) দৃষ্টিরেখার অভিস্রুতি (Convergence of lines of vision)

—যেখানে দুইটি চক্ষুর দ্বারা কোন দূরবর্তী বস্তু (যেমন, ৫০।৬০ ফীট দূরের বস্তু) প্রত্যক্ষ করা যায়, সেখানে দৃষ্টিরেখাদ্বয় সমান্তরাল থাকে এবং এইজন্য চক্ষুর পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত শ্লথ থাকে। কিন্তু যখন অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তখন দৃষ্টিরেখাদ্বয়ের অভিস্রুতি (convergence) হয় এবং তাহারা পরস্পর মিলিত হয়। এইজন্য চক্ষুর পেশীগুলির এক প্রকার সঙ্কোচন হয়। পেশীদের এই শ্লথন ও সঙ্কোচন প্রত্যক্ষকারী সচেতনভাবে না করিলেও উহাদের প্রভাবে বস্তুর দূরত্ব বা নৈকট্য সম্বন্ধে অবগতি জন্মিবার সুবিধা হয়।^{১৯}



১ নং চিত্র।

দৃষ্টিরেখা।

ক—অতি দূরবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষকালে দৃষ্টিরেখার সমান্তরাল অবস্থান। খ—নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষকালে দৃষ্টি রেখার অভিস্রুতি।

উপরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দূরত্ব-নির্দেশক যে সকল প্রতীকের উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, দূরত্ব-অবধারণের জন্য চক্ষুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। বার্কলে (Berkeley) এই মতের সমর্থক। বার্কলের মতের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপন করা যায় :

১৯ বাহারা এক চক্ষু-বিশিষ্ট তাহাদের পক্ষে দৃষ্টিরেখার স্রষ্টা অভিস্রুতি সম্ভব নহে এবং তাহারা অনেক সময় ৩।৭ ফীটের অধিক দূরবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যে দূরত্বের পার্থক্য বিশেষ বুঝিতে পারে না।

(১) চক্ষুর গঠনই এইরূপ যে, ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে (directly) স্থান বা দূরত্ব নির্ধারণ সম্ভব নহে। অক্ষিপটে বস্তু-বিশেষের যে প্রতিকৃতি পড়ে, তাহা ‘ক্যামেরার’ ছবির ত্যায় দ্বি-আকৃতি-বিশিষ্ট (two dimensional) অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট এবং উহার মধ্যে সম্মুখ ও পশ্চাতের পার্থক্য (front-back dimension) নাই। আবার, চক্ষু উহার কোণের হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও দূরত্ব মাপিতে পারে না।

(২) শিশু জন্মের পর চক্ষুর মাধ্যমে কোন্টি নিকটে, কোন্টি দূরে এ সকল কিছুই ঠিক করিতে পারে না। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে সে এই ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করে।

(৩) ছানির জন্তু জন্মান্ত ছিল এরূপ ব্যক্তির যে সকল ক্ষেত্রে ছানি অপসারণ সম্ভব হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া প্রথম প্রথম কেবলমাত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাহায্যে বস্তুর দূরত্ব, নৈকট্য কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই।

(৪) চিত্রকর যখন কোন সমতল ক্ষেত্র (যেমন, শাদা কাগজ)-এর উপর নানা ভঙ্গিমায় স্ককৌশলে রেখাঙ্কন করেন, তখন তাহা দেখিলে তিনি কোন্টি দূরে এবং কোন্টি নিকটে বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রতীকের মাধ্যমেই দূরত্ব এবং ঘনত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

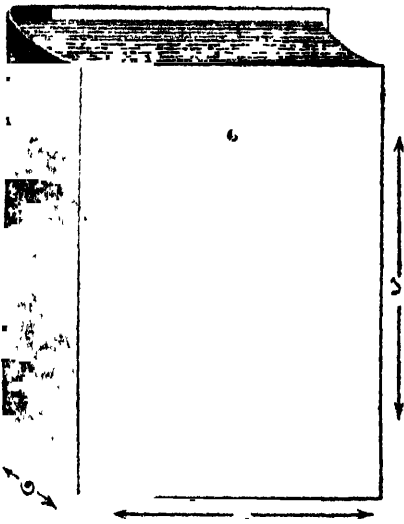
একদল মনোবিৎ (যথা, জেম্‌স্. স্টাউট ইত্যাদি) বার্কলের মত পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা মনে করেন যে স্থান ও দূরত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে চক্ষুর নিজস্ব বা সহজাত একটা ক্ষমতা আছে। তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে অতি দূরে অবস্থিত বস্তুর (যথা, গ্রহ, নক্ষত্র পর্বতচূড়া ইত্যাদির) পারস্পরিক দূরত্ব আমরা চক্ষুর দ্বারা বুঝিতে পারিতাম না—ঐ সকল বস্তুর নিকট গমন করা সম্ভব নহে; সুতরাং এ ক্ষেত্রে মৌলিক স্পর্শন ও পেশীজ সংবেদনের প্রশ্ন উঠে না। তাহা ছাড়া, পরস্পরের অতি নিকটবর্তী দুইটি বিন্দুর মধ্যে যে স্থানগত পার্থক্য আছে, তাহা আমরা চক্ষুর দ্বারা বুঝিতে পারি, কারণ এরূপ স্থলেও কোন মৌলিক স্পর্শন সংবেদন সম্ভব নহে।

আমরা এক্ষেত্রে এই মন্তব্য করিতে পারি যে, অধিকাংশ স্থলেই বার্কলের মতবাদই গ্রহণযোগ্য। তবে দূরত্ব ও স্থান প্রত্যক্ষের নিজস্ব কোন ক্ষমতা

যদি চক্ষুর থাকে, তাহা হইলে উহা স্বপ্নভাবে থাকে এবং তাহা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রকাশমান হইতে পারে।^{২০}

৭। ঘনবস্তুর প্রত্যক্ষ (Perception of Solid Objects) :

দূরত্ব প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পূর্ব অনুচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে, ঘনবস্তুর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য। ঘনবস্তু মাত্রই ত্রি-মূর্তি-বিশিষ্ট



১০ নং চিত্র।

উপরের ছবিটি একটি ঘনবস্তুর (যথা, পুস্তকের) বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিত করিতেছে।

১—দৈর্ঘ্য; ২—প্রস্থ; ৩—গভীরত্ব বা ঘনত্ব। সরাসরিভাবে উহার ঘনত্ব বুঝিতে পারি।

(three dimensional); অর্থাৎ ঘনবস্তু মাত্রেরই দৈর্ঘ্য (length), প্রস্থ (breadth) ও গভীরতা বা ঘনত্ব (depth) থাকে। (১০ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঘন বস্তুর ঘনত্বই হইল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইহাকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় স্পর্শন ও পেশীজ সংবেদনের মাধ্যমে। যখন কোন জড়বস্তুকে আমরা হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরি, তখন আমরা

তবে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাহায্যে ঘনবস্তুকে ঘন বলিয়া বুঝিতে পারি। আমরা দুইটি চক্ষু দ্বারা যখন কোন ঘনবস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন দুইটি চক্ষুর অক্ষিপটের উপর যে দুইটি প্রতিকৃতি পড়ে তাহাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্যও থাকে সেইরূপ বৈসাদৃশ্যও থাকে। ডান চক্ষু দ্বারা আমরা ডানদিকের অংশ অধিকতর দেখিতে পাই এবং বাম চক্ষু দ্বারা বামদিকের অংশ অধিকতর দেখিতে পাই। এই দুইটি সামান্য পৃথক প্রতিকৃতির উদ্দীপন গুরুমস্তিষ্কে পৌছাইয়া সংমিশ্রিত (fused) হইয়া একটি সম্পূর্ণ ঘনবস্তুর প্রতিকৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

এই মতের সত্যতা ঘনদৃক্যস্ত্র (stereoscope)-এর বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে

প্রমাণিত হয়। ঘনদৃক্‌যন্ত্রে একই বস্তুর দুইটি সামান্য পৃথক্‌ ছবি একত্রে দেখান হয়। ছবি দুইটির একটি ডানচক্ষুর দৃষ্টিকোণ হইতে গৃহীত এবং অপরটি বাম চক্ষুর দৃষ্টিকোণ হইতে গৃহীত হয়। এইজন্য ছবি দুইটি একই বস্তুর হইলেও সামান্য পৃথক্‌ হয়। এই দুইটি ছবি ঘনদৃক্‌যন্ত্রে যথাস্থানে আটকাইয়া যদি দুইটি চক্ষু ‘অবলোকন গোলক’ (view finder)-এর উপর স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে দুইটি মিশিয়া একটি ঘনবস্তুর ছবি দেখা যায়।

৮। উপর-নীচু, ডান-বাম প্রত্যক্ষ (Visual Perception of Up and Down, Right and Left) :

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে (পৃঃ ৫৬২) লক্ষ্য করিয়াছি যে, অক্ষিপটের উপর বস্তুর যে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহা প্রকৃত বস্তুর ঠিক বিপরীত, প্রকৃতবস্তুর যাহা উপরিভাগ প্রতিকৃতির তাহা নিম্নাংশ এবং প্রকৃতবস্তুর যাহা নিম্নাংশ প্রতিকৃতির তাহা উপরিভাগ; আবার প্রকৃতবস্তুর যেটি বাম দিক্‌, প্রতিকৃতির সেটি ডান দিক্‌ এবং প্রকৃত বস্তুর যেটি ডান দিক্‌, অক্ষিপটের উপর পতিত প্রতিকৃতির সেটি বাম দিক্‌। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, প্রতি বস্তুর প্রতিকৃতি যদি উল্টাভাবে পড়ে, তাহা হইলে বস্তুগুলিকে সোজাভাবে বুঝি কি করিয়া? ইহার সম্পূর্ণ উত্তর আমাদের জানা নাই। এ বিষয় গুরুমস্তিষ্ক নিশ্চয়ই কিছু অংশ গ্রহণ করে; কিন্তু উহা ঠিক কী ভাবে অক্ষিপটের প্রতিকৃতিকে আবার সোজা করিয়া লয় তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, স্পার্শন ও পেশীয় সংবেদন এ বিষয়ে চাক্ষুষ সংবেদনের সহযোগিতা করে। যখন আমরা কোন বস্তুর উপরিভাগ দেখিতে চাহি, তখন আমাদের স্বাক্ষ ও মুখাবয়ব উপর দিকে করিতে হয়, এবং যখন নীচের দিকে কিছু দেখিতে হয়, তখন মাথা নামাইতে হয়। সেইরূপ ডান-বাম দেখিবার জন্যও মুখমণ্ডল ঘুরাইতে হয়। তাহা ছাড়া, উঁচু জায়গা হইতে কিছু নামাইতে হইলে হাত উপর দিকে তুলিতে হয় এবং মাটি হইতে কিছু কুড়াইতে হইলে হাত নীচের দিকে করিতে হয়। এইরূপভাবে বিভিন্ন দিকে অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে বিভিন্ন প্রকার পেশীয় সংবেদন হয় এবং অভিজ্ঞতার ফলে এক এক প্রকার অঙ্গসঞ্চালন এক একটি দিকের নির্দেশক হইয়া পড়ে; অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ অভিজ্ঞতার ফলে ইহাই বুঝিতে পারে যে, অক্ষিপটের

প্রতিক্রিয়াতে যাহা নিম্নভাগ, তাহাকে দেখিতে মুখমণ্ডল তথা চক্ষুগল উপর দিকে করিতে হয়, এবং উহাকে স্পর্শ করিতে উপর দিকে হাত তুলিতে হয়।

উপর-নীচ এবং ডান-বাম ধারণা করিবার ব্যাপারে চক্ষুগলকের ঘূর্ণন অপেক্ষা স্পর্শন ও পেশীয় সংবেদন যে বিশেষ সহায়তা করে, তাহা প্রমাণিত হয় স্ট্রাটন (G. M. Stratton)-পরিচালিত এক পরীক্ষণের মাধ্যমে।^{২১} তিনি এক বিশেষ প্রকারের চশমা নির্মাণ করেন যাহা ব্যবহার করিলে ব্যবহারকারীর অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ ঐ বিশেষ প্রকারের চশমাবিহীন অবস্থায়) প্রতিফলিত প্রতিক্রিয়ার ঠিক উল্টা হইবে; অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুর প্রতিক্রিয়া সোজাভাবেই অক্ষিপটে পড়িবে। কিন্তু গুরুমস্তিষ্কে উদ্দীপন পৌঁছাইলে অক্ষিপটের প্রতিক্রিয়া আবার উল্টা হইয়া যাইবে। ফলে হইল যে, সমস্ত জাগতিক বস্তুই যেন ১৮০° কোণ রচনা করিয়া ঘুরিয়া গেল। এই চশমা সর্বদা ব্যবহারের অবস্থায় পরীক্ষণকারীকে প্রথম প্রথম বিশেষ বিভ্রাটে পড়িতে হইল—যাহা উপরে আছে মনে হইতেছে, তাহাকে স্পর্শ করিতে হাত নীচুর দিকে নামাইতে হইল; সেইরূপ, যাহা ডানদিকে আছে তাহার নিকটে বাইবার জন্ত যতই ডান দিকে যাওয়া যায়, ততই উহা যেন আরও দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল! স্বতরাং, উহাকে পাইবার জন্ত বাম দিকে যাইতে হইল। কিছুদিন ব্যবহারের পর পরীক্ষণকারী যেন উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলেন—স্বতরাং নূতন অভ্যাসের ফলে যখন উপর হইতে কিছু নামাইতে হইল তখন তিনি স্বতঃই মাথা নীচু দিকে করিয়া হাত উপরের দিকে তুলিতে লাগিলেন এবং নীচের কিছু দেখিবার জন্ত মাথা উঁচু করিতে লাগিলেন।

শ্রোত্র সংবেদন ও দিকনির্ণয়—কেবল যে চাক্ষুষ সংবেদনের মাধ্যমে দিক সন্থকে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা নহে; শ্রোত্র সংবেদনও এই ব্যাপারে সহায়তা করে। আমরা সাধারণতঃ দুই কর্ণের সাহায্যে (বা binaural hearing-এর ফলে) শুনিয়া থাকি; কিন্তু যে দিক হইতে বায়ুতরঙ্গ আসে, সেই দিকের কর্ণ অপর কর্ণ অপেক্ষা যেন একটু বেশী উদ্দীপিত হয় এবং সেই দিকের কর্ণদ্বারা শ্রুত শব্দ যেন অপেক্ষাকৃত

^{২১} *Psychological Review* (Vols. III & IV) এবং তৎসহ *Genetic Psychological Monogram* (1930) দ্রষ্টব্য।

উচ্চঃস্বরের মনে হয়। সেইজন্য যদি শব্দের উৎপত্তিস্থল দুই কর্ণ হইতে সমান দূরত্ব বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে শ্রোত্র সংবেদন দ্বারা শব্দের দিক্ নির্ণয় করার অসুবিধা হয়। তবে চাক্ষুষ সংবেদনের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র শ্রোত্র সংবেদন দিক্ নির্ণয় যথাযথভাবে করিতে পারে না।

এই বিষয়ে ইয়ং (P. T. Young)

একটি অভিনব 'স্বনযন্ত্র' (pseudophone) তৈয়ারী করেন। (১১নং চিত্র)। ইহাতে দুইটি চোঙ আছে—একটি চোঙের সরু দিক্টি বাম কাণে আটকান থাকে, কিন্তু চোঙের মুখটি মাথার উপর দিয়া ডান কানের সম্মুখে থাকে ; অপর চোঙের সরু



১১ নং চিত্র।

ইয়ং কর্তৃক পরিকল্পিত স্বনযন্ত্র।

দিক্টি ডান কানে আটকান থাকে, কিন্তু চোঙের মুখটি মাথার উপর দিয়া আসিয়া বাম কানের সম্মুখে থাকে। পরীক্ষণ-পাত্রের চোখ দুইটি বাঁধিয়া দিয়া স্বনযন্ত্রটি (pseudophone) লাগাইয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হইল। যেমন, তাহার ডান দিক্ হইতে কেহ তাহাকে কাছে আসিতে বলিলে সে তাহার কাছে যাইবার জন্য বাম দিকে চলিয়া যাইত, কারণ ঐ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে বাম দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে বলিয়া তাহার মনে হইত। তবে চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিবার পর এইরূপ ভ্রম কমিয়া গেল। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, শ্রোত্র সংবেদনও দিক্ নির্ণয়ে কিছু অংশ গ্রহণ করে।

৯। গতি প্রত্যক্ষ (Perception of Movement) :

স্পর্শন ও পেশীয় বেদন, এবং চাক্ষুষ সংবেদনের মাধ্যমে গতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

স্পর্শন ও পেশীয় বেদনের মাধ্যমে গতি বুঝা যায়। যদি কাহারও চর্মের উপর কোন কিছু (যেমন, একটি পিপীলিকা) চলিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে উহার দ্বারা চর্মের বিভিন্ন স্পর্শ বিন্দুগুলি একটির পর একটি উদ্দীপিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে সে ঐ বস্তুটি যে গতিশীল তাহা বুঝিতে পারে। এক্ষেত্রে স্পর্শ হইল নিষ্কট (passive)।

আবার, যদি কোন চলমান বস্তুর উপর (যথা, ছেলেদের খেলার

মোটর গাড়ীর উপর) হাত রাখা যায় এবং উহা চলার সহিত হাতটিকেও চালান যায়, তাহা হইলে গতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। [এ ক্ষেত্রে স্পর্শ হইল সচেত (active)—ইহার সহিত স্পর্শন ও পেশীয় সংবেদন উভয়ই থাকে।

আবার চাক্ষুষ সংবেদনের সাহায্যেও গতি সম্বন্ধে অবগতি জন্মে। যেমন, যদি চক্ষুদ্বারা কোন গতিশীল বস্তুকে স্থিরভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা হইলে একই বস্তু সম্বন্ধে চাক্ষুষ সংবেদনের একটি পরস্পরার সৃষ্টি হয়। চাক্ষুষ সংবেদনের এই দ্রুত পরিবর্তন আমাদের ইচ্ছাধীন নহে; সুতরাং ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই পরিবর্তনের কারণ হইল বিষয়-বস্তুর নিজস্ব গতি।

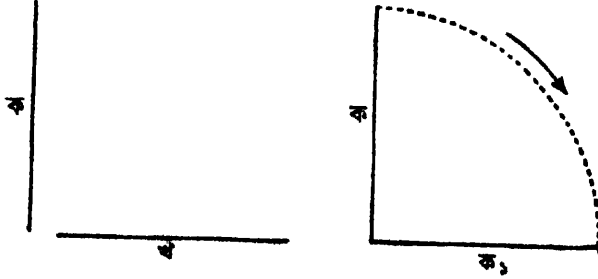
তাহা ছাড়া, চলমান বস্তুর গতির সহিত আমরাও চক্ষুর দ্বারা উহাকে অনুসরণ করিতে পারি। এক্ষেত্রে চক্ষুসঞ্চালনের গতি ও দিক আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে—সুতরাং আমরা অনুমান করি যে, প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুর গতিই এই সঞ্চালনের কারণ।

ইহা ব্যতীত আবার আপাত বা ভ্রান্ত গতিরও প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ বাস্তবিক বস্তু-বিশেষের গতি নাই, অথচ উহা গতিশীল বলিয়া মনে হয়।^{২২} যদি একই আকারের দুইটি সরলরেখার একটিকে দেখাইয়া তাহার পর ঠিক সেকেন্ড বাদে আর একটি সরলরেখা দেখান যায়, তাহা হইলে মনে হয় যেন একই রেখা এক স্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া গেল। আবার ঐরূপ রেখাদ্বয়ের একটিকে লম্বভাবে দেখাইয়া তাহার পরই অতি অল্প ব্যবধানে যদি একই দৈর্ঘ্যের আর একটি রেখাকে শয়ানভাবে দেখান যায়, তাহা হইলে মনে হয় যে, একই রেখা যেন পড়িয়া গেল। (১২ নং চিত্র)। গেস্টাল্টবাদীরা এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন (পৃ: ১০৬-১০৭)। ইহাকে বলা হয় ফাই-ব্যাপার (Phi-phenomenon)।

ছায়াচিত্রে যে সকল ছবি দেখান হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে হইল এক একটি ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলি নিশ্চল প্রতিকল্প। কিন্তু এগুলি এত দ্রুত পর্দার উপর অভিক্ষিপ্ত হয় যে, মনে হয় একই বস্তু বা ব্যক্তি

২২ ইহাকে ভ্রমদৃষ্টি-সংক্রান্ত দৃষ্টি (stroboscopic vision) বলা হয়।

নড়িতেছে। একটি ছবির পর আর একটি ছবি প্রদর্শিত হওয়ার মধ্যে সাময়িক ব্যবধান এত অল্প যে, দর্শকবৃন্দ উহা লক্ষ্য করে না।



১২নং চিত্র।

প্রথমে 'ক' এবং তাহার অব্যবহিত পরেই 'খ'-কে দেখাইলে মনে হয় যেন 'ক'-রেখাটিই ৯০° কোণ গঠন করিয়া পড়িয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে, তথাকথিত 'ক১'-রেখাটি হইল 'খ'-রেখা।

এইজ্ঞাত্বে গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, গতিপ্রত্যক্ষের ক্ষমতা চক্ষুর পক্ষে একটি মৌলিক ক্ষমতা এবং উহা অনুমান-লব্ধ নহে। আমরা উপরে চক্ষু দ্বারা গতিপ্রত্যক্ষের যে ব্যাখ্যা দিয়াছি গেস্টাল্টবাদীরা তাহা গ্রহণ করেন ন'।

১০। কাল প্রত্যক্ষ

(Perception of Time) :

স্থান প্রত্যক্ষ (space perception)-এর ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনের ফলে স্থান সম্বন্ধে অবগতি জন্মে, কাল প্রত্যক্ষ (temporal perception)-এর ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় নাই। সময় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণার মূলে আছে কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে অবগতি—যে ঘটনাগুলির কতকগুলি অতীত, কতকগুলি বর্তমান এবং কতকগুলি ভবিষ্যতের। অর্থাৎ ঘটনাস্রোত অবধারণের ফলে আমরা উহার মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের যে সীমারেখা টানি তাহারই সাহায্যে সময়ের প্রবাহ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

সময় সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহার মধ্যে ব্যাপকতা (duration) এবং ক্রমপর্যায় (succession)-এর জ্ঞান থাকে। একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কিছুক্ষণ ধরিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং তাহার পর আর একটি ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করি—ইহার ফলে ব্যাপকতা (duration) সম্বন্ধে অবগতি জন্মে। আবার এইভাবে ঘটনা হইতে ঘটনাস্রোতের অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমপর্যায় (succession) সম্বন্ধেও জ্ঞান জন্মে; অর্থাৎ আমাদের সচেতন অবস্থায় একটি অভিজ্ঞতা-পরম্পরা (series of experience) চলিয়াছে—যাহা এখন বর্তমান, পর মুহূর্তেই তাহা অতীত হইয়া পড়িতেছে এবং যাহা ছিল ভবিষ্যৎ

তাহা বর্তমান হইতেছে; সময়ের অবগতি ইহারই ফলে জন্মে। সময়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে 'এখন' (now), 'তখন' (no more) এবং 'এখনও নয়' (not yet) এই তিনের সংযোগ ঘটিয়াছে। এইজন্য সময়ের অভিজ্ঞতার জন্য স্মৃতি, কল্পনা ও আশা (memory, imagination and expectation), ইহাদের সাহায্য প্রয়োজন।

তবে 'এখন' বা 'বর্তমান'-এর তাৎপর্য কী? সম্পূর্ণ বা নিছক বর্তমান বলিতে কিছু নাই। বর্তমানের সাময়িক ব্যাপকতা যত কমই হউক না কেন, উহা অবধারণ করিতে না করিতে উহার কিয়দংশ অতীতে চলিয়া যাইতেছে এবং ভবিষ্যতের কিয়দংশ উহার সহিত যুক্ত হইতেছে। এইজন্য জেমস্ বলিয়াছেন যে, তথাকথিত 'বিস্তৃত' বর্তমান হইল 'অলীক বর্তমান' (specious present)। আমরা যখন 'বর্তমান' কথাটি উচ্চারণ করি, তখন 'ব' অক্ষরটি যখন বলিতেছি, তখন 'ন' অক্ষরটি ভবিষ্যতের অন্তর্গত, আবার যখন 'ন' অক্ষরটি উচ্চারণ করিলাম, তখন 'ব' অক্ষরটি অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তায় যাহাকে 'বর্তমান' বলি তাহা কতকটা 'স্থূল', অর্থাৎ তাহার মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।^{২৩} অবশ্য এই ক্ষেত্রে 'ভূত' বা অতীত বলিতে 'সাম্প্রতিক অতীত' বা 'সম্প্রতিগত বর্তমান' (very recent past) এবং 'ভবিষ্যৎ' বলিতে 'অতি নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ' (very near future) বঝিতে হইবে। অতীত ও ভবিষ্যতের এই ধারণা মনোযোগের ফলে সৃষ্টি হইয়া উঠে। মনোযোগ সহকারে যদি মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বর্তমানের সহিত সংশ্লিষ্ট অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা স্পষ্টতর হয়।^{২৪}

২৩ জেমসের ভাষায় "...the practically cognised present is no knife-edge, but a saddle-back with a certain breadth of its own; and from which we look in two directions into time. The unit of composition of our perception of time is a *duration* with a bow and a stern, as it were—a rearward- and a forward-looking end." (James, *Principles of Psychology*, I, p. 609).

২৪ স্টুটনীয় : "In general temporal perception is bound up with the process of attention. The primary experience of 'pastness' is involved in the cumulative effect of attention on its own process. The primary experience of 'futureness'...is involved in the essentially prospective nature of attention," (Stout, *Manual of Psychology*, pp. 499-500).

এই প্রসঙ্গে স্বরণ রাখিতে হইবে যে, সময় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণা (subjective estimate of time) সময় সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা (objective estimate of time) হইতে পৃথক্। সময়ের বাস্তব ধারণা করিবার জন্ত কতকগুলি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মান আছে; যেমন, দিনরাত্রির পরিবর্তন, সূর্য-চন্দ্রের অবস্থান ইত্যাদির মধ্যে একটা নিয়মানুবর্তিতা আছে এবং ইহাদের সাহায্যে সময়ের ধারণা জন্মে। তাহা ছাড়া, সভ্যজগতে ঘড়ির আবিষ্কারের পর হইতে সময়ের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মান নির্ধারণের সুবিধা হইয়াছে।

সময়ের ব্যক্তিগত ধারণা কিন্তু এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মান দ্বারা সূচিত সময় হইতে অনেক সময়েই পৃথক্ হইয়া পড়ে। যেহেতু সময়ের ব্যক্তিগত ধারণা মনোযোগের উপর নির্ভর করে, সেইজন্য যাহার উপর সহজেই মনোযোগ দেওয়া যায়, তাহা স্বল্পস্থায়ী মনে হয়। যে জিনিষ চিত্তাকর্ষক, আনন্দদায়ক, তৃপ্তিকর সেইগুলির উপর সহজেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং ঐগুলি সন্ধক্ষে অভিজ্ঞতাকালে মনে হয় যে, সময় অত্যন্ত দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। স্বমধুর সঙ্গীত, ভাল গল্প ইত্যাদি শুনিবার কালে সময় যেন খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। কিন্তু যাহা বিরক্তিকর এরূপ কোন কিছু অভিজ্ঞতাকালে মনে হয় যেন সময় আর কাটিতেছে না। যেমন, কোন বক্তৃতা শোনার কালে বক্তা যদি সরল ও চিত্তাকর্ষকভাবে বক্তব্য বিষয় বলিতে না পারেন, অথবা কোন নাটক দর্শনকালে যদি কাহিনীবিহীন, অভিনয় ইত্যাদি স্তূৰ্ভভাবে সাধিত না হয়, তাহা হইলে মনে হয় যেন সময় আর কাটিতেছে না। সেইরূপ উৎসবমুখর গৃহে সময় কখন কাটিয়া যাইতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারে না; অপর পক্ষে শোকাচ্ছন্ন গৃহের অধিবাসীদের পক্ষে মনে হয় যে, ঘড়ি যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে—সময় আর চলিতেছে না।

ইহা ছাড়া, আমরা সকলেই এক এক সময় বিশেষ বিশেষ কার্য করার অভ্যাস করিয়াছি (যেমন, প্রাতঃকৃত্যাদি করা, প্রাতরাশ আহার করা, স্নান করা, নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি)। এক একটি সময়ের ব্যবধানে দেহ ও মনের দিক্ হইতে ঐ সব কার্যের জন্ত যেন ‘তাগিদ’ আসে। ইহা হইতেও আমরা সময়ের গতির কিছু পরিমাণ আন্দাজ করিতে পারি।

বিংশ অধ্যায়

স্মৃতি

আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়-বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। কিন্তু যখন বিষয়-বস্তু আমাদের সম্মুখে থাকে না, তখন কি উহার সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতে পারি না, তখন কি উহার সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারি না? প্রাক্তন অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুর একটি ‘আলেখ্য’ বা ‘ছবি’ আমাদের অন্তরে থাকিতে পারে এবং ইহারই ফলে বিষয়-বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে না থাকিলেও আমরা উহার ধারণা করি। বস্তু-বিশেষের এই মানসিক আলেখ্যকে বলে ‘প্রতিরূপ’ এবং উহাকে মনে রাখা ও প্রয়োজন মত জাগরিত করাকে বলে স্মৃতি। এই স্মৃতির বিবিধ বৈশিষ্ট্য বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

১। প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু এবং স্মৃতি-প্রতিরূপ (Percept and Memory-image) :

প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি-প্রতিরূপের পার্থক্য নিম্নলিখিত প্রকার :

(ক) যখন কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে এবং আমরা ঐ বস্তুকে বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন উহাকে প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু বলা হয়। আবার যখন কোন বস্তুকে অতীতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যখন উহা আমাদের সম্মুখে নাই, অথচ উহার আলেখ্য আমাদের মনে জাগরিত হইতেছে, তখন উহাকে বলে স্মৃতি-প্রতিরূপ। স্মরণ দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষের মূলে আছে ইন্দ্রিয়-উদ্দীপন, কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে যে বস্তুর স্মৃতি হইতেছে তাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়-উদ্দীপন সম্ভব নহে। আমার সম্মুখে একটি বই আছে, আমি উহা দেখিতেছি—এক্ষেত্রে বইটি হইল প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু। কিন্তু আমি গতবৎসর তাজমহল দেখিয়াছিলাম এবং এখন উহা স্মরণ করিতেছি—এক্ষেত্রে তাজমহলের প্রতিরূপ আমার অন্তরে জাগরিত হইতেছে। ইহাই হইল প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু ও প্রতিরূপের মধ্যে মূল পার্থক্য।

(খ) প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তুর মধ্যে একটি সজীবতা (liveliness) আছে, কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে উহার অভাব। প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু যেন কতকটা জোর করিয়া বাহির হইতে আসিয়া মনের উপর ‘আঘাত’ করে, কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে বাহির হইতে মনের উপর ‘আঘাত’ করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না; কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপ যত স্পষ্টই হউক উহার মধ্যে এই সজীবতার অভাব আছে।^১ কেহ যদি অতি মৃদুস্বরে বা চুপি চুপি কথা বলে তাহার মধ্যেও যে সজীবতা আছে, তাহা কোন বস্তুর শব্দের স্মৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। এই পার্থক্য কেবল পরিমাণগত নহে, ইহা প্রকৃতিগতও বটে; কারণ এই যে সজীবতা ইহা উদ্দীপকের তীক্ষ্ণতা বা তীব্রতা (intensity)-এর নির্দেশক এবং উদ্দীপকমাত্রেরই কোন-না-কোন প্রকারের তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা থাকে।

(গ) প্রত্যক্ষের বিষয়-বস্তু বাস্তবের সহিত যে-ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে স্মৃতি-প্রতিরূপ সেইভাবে বাস্তবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে না—অতীতের যে বাস্তব পরিবেশের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট ছিল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মনোজগতে ইহা আবির্ভূত হয়।

(ঘ) যখনই কোন কিছুকে আমরা কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই বিশেষ ইন্দ্রিয় ত’ উদ্দীপিত হয়ই, পরন্তু অগ্ন্যাগ্ন ইন্দ্রিয়ও উহার সহিত সহযোগিতা করে। যেমন, রাসন সংবেদনের সহিত ভ্রাণজ সংবেদন এবং চার্ম সংবেদন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে; কিন্তু যখন আমরা অতীতের রাসন অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন উহার সহিত জড়িত অগ্ন্য সংবেদনের স্মৃতি জাগরিত হয় না। আবার যখন আমরা কোন শব্দ শুনি, তাহার সহিত দিক্ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা হয় (পৃ: ৬০২)। কিন্তু যখন অতীতের কোন শব্দের স্মৃতি ভাসিয়া উঠে, তখন দিক্ সম্বন্ধীয় কোন অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাহার সহিত সাধারণতঃ জড়িত

১ দার্শনিক হিউম্ (Hume) প্রতিরূপ (image) হইতে প্রত্যক্ষ (impression)-এর পার্থক্য করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্য ইহা, “force or liveliness with which they strike upon the mind.”

থাকে না। প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর যে সমগ্রত্ব থাকে, প্রতিরূপের ক্ষেত্রে তাহা যেন কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।^২

(ঙ) প্রত্যক্ষের মূলে আছে ‘উদ্দীপক’—এই উদ্দীপক যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, ততক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ইহার তুলনায় প্রতিরূপ হইল অপেক্ষাকৃত চঞ্চল (flickering)—মনঃসংযোগ দ্বারা চেষ্টাপূর্বক ইহাকে চেতনার কেন্দ্রে ধরিয়া না রাখিলে ইহা যেন অচিরে অদৃশ্য হইয়া যায়। এমন কি যেখানে চেষ্টা সহকারে ইহাকে ধরিয়া রাখা যায়, সেখানেও ইহার স্পষ্টতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, কারণ আমাদের অবধান-তরঙ্গ যেন সর্বদাই ‘উঠা-নামা’ করে (পৃ: ৪৭২)।

(চ) যেমন, একদিক্ হইতে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত স্থির এবং প্রতিরূপ চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল, সেইরূপ আর এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হইতে পারে, অথচ প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তিত থাকিতে পারে। ইহা সম্ভব হয় যখন প্রত্যক্ষকারী এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে, অথচ তাহার মন একই ব্যক্তি বা বস্তুর চিন্তা করে। যেমন, একজন ব্যক্তি তাহার মাতার অসুখের সংবাদ পাইয়া রেলযোগে দেশে ফিরিতেছে। সে গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে; স্মরণ্য রেলগাড়ী যখন ছুটিতেছে, তখন ঐ ব্যক্তির প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে; কিন্তু সে হয়ত’ একমনে তাহার রোগক্লিষ্টা মাতার কথা ভাবিতেছে এবং তাহার মাতার মুখচ্ছবি ক্রমাগতই তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিতেছে। স্মরণ্য এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্রতিরূপ মোটামুটি একই থাকিতেছে।

২। প্রতিরূপ ও ধারণা (Image and Idea) :

সংবেদনের উপর ব্যাখ্যা আরোপিত হইলে উহাকে যেমন প্রত্যক্ষ বলে,

২. তুলনীয় : “In the mental image there is little or no reinstatement of consensience. The sensory elements of the image are detached from the total mass of impressional experience of which they could form part, if they occurred as actual sensation.” (Stout, *Manual of Psychology*, p. 135).

সেইরূপ প্রতিরূপের উপর ব্যাখ্যা যুক্ত হইলে উহাকে ধারণা (idea) বলে। অর্থাৎ সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের যে সম্বন্ধ, প্রতিরূপের সহিত ধারণারও সেই সম্বন্ধ। ইহার অর্থ এই নহে যে, প্রতিরূপ ও ধারণা চেতনার দুইটি বিভিন্ন অবস্থা; চেতনার যে অবস্থাকে অতীত সংবেদনের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে কেবলমাত্র প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে, সেই একই অবস্থাকে উহার উপর আরোপিত অর্থের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে ‘ধারণা’ বলা যায়।^৩ অবশ্য ‘বিগত সংবেদন’ যেমন পৃথকভাবে থাকিতে পারে না, যেমন সংবেদনের আবির্ভাবমাত্র উহা ব্যাখ্যাত হয়, সেইরূপ প্রতিরূপ মাত্রই অল্পবিস্তর ব্যাখ্যাত (interpreted) হয়, অর্থাৎ উহা কিসের প্রতিরূপ সেই সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু প্রতীতি জন্মে। আবার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যেরূপ সংগঠন ও বিজ্ঞাস (organisation and arrangement) হয়, সেইরূপ প্রতিরূপেরও পুনর্গঠন ও বিজ্ঞাস হয় (পৃ: ৬১৮-১৯ দ্রষ্টব্য)।

৩। প্রতিরূপের প্রকারভেদ (Kinds of Images) :

প্রতিরূপ প্রধানতঃ দুই প্রকারের—স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনার প্রতিরূপ (memory image এবং image of imagination)। স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বতন অভিজ্ঞতাকে মানসিক প্রতিচ্ছবির আকারে পুনরুৎপাদিত করিবার চেষ্টা করি। ইহাতে আমরা অতীতে ঘটনাপরম্পরা যেরূপভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, প্রতিরূপের আকারে সেইভাবে উহাদের জাগ্রত করিবার চেষ্টা করি (যদিও কার্যক্ষেত্রে উহারা সকল সময় অতীত অভিজ্ঞতার যথার্থ প্রতিলিপি হয় না)। অপরপক্ষে, কাল্পনিক প্রতিরূপ গঠনে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

স্মৃতি-প্রতিরূপ বলিতে এমনই এক অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিলিপি বুঝায় যাহা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যবর্তী কতকগুলি প্রতিরূপ থাকিতে পারে—এইগুলি সত্ত্ব অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি হইতে পারে।

৩ তুলনীয়: “Images and ideas do not refer to two different states of consciousness, but to one and the same state, looked at now from the side of sensory character, and now from the side of meaning.” (Angell, *Psychology*, p. 201).

(১) **অনুবেদন (after-image)**—উদ্দীপক সত্তা তিরোহিত হইয়াছে, অথচ সংবেদন অল্পক্ষণ চলিতেছে—এইরূপ অবস্থাকে অনুবেদন বলে। চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে ইহা আবার সর্বর্ণ (positive) এবং অসর্বর্ণ (negative) এই দুই প্রকারের হইতে পারে। (পৃঃ ৫৬৬ দ্রষ্টব্য)।

ইহা পুরাপুরি স্মৃতি-প্রতিরূপ নহে, কারণ সংবেদনের সহিত অনুবেদনের একটি নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) থাকে, কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে ‘অতীত অভিজ্ঞতা’ এবং ‘প্রতিরূপের মাধ্যমে উহার পুনর্জাগরণ’ এই দুইয়ের মধ্যে একটি ছেদ থাকে।

(২) **পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ (Recurrent or Resilient Image) :**

আমরা যদি কোন চিত্তাকর্ষক বা উত্তেজক ঘটনা গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে মধ্য মধ্য এরূপ হয় যে, কিছু সময়ের ব্যবধান অন্তর কেবলই ঐ ঘটনার প্রতিরূপ জাগরিত হয়। যেমন, অনুবীক্ষণযন্ত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্ষুদ্র জীবাণু পর্যবেক্ষণ করার পর এমন হইতে পারে যে, মধ্য মধ্য পর্যবেক্ষকের মানসক্ষেপে যেন উহাদের ছবি হঠাৎ জাগিয়া উঠে। সেইরূপ কোন বীভৎস দৃশ্য (যেমন, নরহত্যা) দর্শন করিলে এমন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষদর্শীর মনে কিছু সময় পর পর ঐ দৃশ্য যেন ভাসিয়া উঠে। এইরূপ মানস প্রতিচ্ছবিকে ‘পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ’ বলে।

(৩) **প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ (Primary memory-image) :**

যে উদ্দীপক সত্তোবিগত হইয়াছে মধ্য মধ্য তাহার স্মৃতির উদ্ভেক হয়। যেমন, এই মাত্র কেহ যেন দরজায় কড়া নাড়িল, বা নাম ধরিয়া ডাকিল বা কে যেন রাস্তায় পাশ দিয়া চলিয়া গেল; ঠিক সেই মুহূর্তে উহা প্রত্যক্ষ না করিলেও উহার অব্যবহিত পরেই ঐ সম্বন্ধে প্রতীতি হইতে পারে।^৪ এখানে বলা যাইতে পারে যে, উদ্দীপক সত্তোবিগত হইলেও উহার যেন ক্ষীণরেখা

^৪ Ward-এর ভাষায় : “A knock at the door, the hour struck on the clock, the face of a friend whom we have passed unnoticed, can sometimes be recognised a few moments later by means of the persisting image, although *apparently* the actual impression was entirely disregarded.” (*Psychological Principles*, p. 175).

প্রতিরূপের মাধ্যমে জাগরুক থাকে এবং উহাই উদ্দীপক সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মায়। প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ উহার আবির্ভাবের প্রথম অবস্থায় উদ্দীপকেরই ত্রায় স্পষ্ট থাকে।

(৪) আইডেটিক্ প্রতিরূপ (Eidetic Image) :

এক প্রকারের প্রতিরূপ আছে যে সম্বন্ধে সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অভিজ্ঞতা জন্মে। ইহাকে ‘আলোকচিত্রতুল্য স্মৃতি’ (photographic memory) বলা হয়। এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন জার্মান মনোবিৎ য়েন্শ্ (E. R. Jaensch); এবং আল্পোর্ট (G. W. Allport) ইত্যাদিও অনুরূপ অনুসন্ধান কার্য চালান।^৫ এইরূপ যথাযথ প্রতিরূপকে বলা হয় ‘আইডেটিক্ প্রতিরূপ’ (Eidetic Image)।

আইডেটিক্ প্রতিরূপের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ :

(১) ইহা সাধারণতঃ ১২ বৎসরের (কেহ কেহ বলেন, ১৪ বৎসরের) নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই বয়সের শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জনের মধ্যেই আইডেটিক্ প্রতিরূপ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দেখা যায়। পরিণতবয়স্কদের শতকরা ১ হইতে ১০ জনের এইরূপ ক্ষমতা থাকিলেও থাকিতে পারে।

(২) যদি শিশুদের অতি অল্পক্ষণ (যেমন, কমবেশী ৩৫ সেকেন্ড) কোন ছবি দেখাইয়া বন্ধ করা যায় এবং তাহার পর যদি তাহাদের কোন ধূসর ক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া ছবিটি বর্ণনা করিতে বলা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, তাহারা যথাযথভাবে ঐ ছবি বর্ণনা করিতে পারিতেছে ; এমন কি, অনেক স্থলে জটিল ও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যও তাহারা সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে পারিতেছে।^৬

৫ ১৯২৪ সালের *British Journal of Psychology*-তে একটি প্রবন্ধে আল্পোর্ট তাহার পর্যবেক্ষণের কলাকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৬ অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশুগণ ছবির সকল বৈচিত্র্যই প্রায় সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারে ; অর্থাৎ ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তি-বিশেষের ভাষার কয়টি বোতাম আছে, কয়টি গাছ আছে, কয়টি গাড়ী আছে, গাড়ীগুলি কি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই তাহারা ছবিটি দেখিবার পর হুবহু বলিতে পারে। আল্পোর্ট-প্রদর্শিত একটি ছবিতে সাইন্-বোর্ডে একটি জার্মান শব্দ লেখা ছিল। ঐ ভাষার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কয়েকটি ইংরাজ-শিশু নিভুলভাবে উহার বানান পর্যন্ত বলিতে পারিয়াছিল।

(৩) সাধারণ স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রতিরূপের ‘অধিষ্ঠান’ ব্যক্তি-বিশেষ তাহার মনের মধ্যেই আছে বলিয়া মনে করে ; কিন্তু আইডেটিক্ প্রতি-রূপের ক্ষেত্রে শিশু মনে করে যে, তাহার সম্মুখেই সে যেন পূর্ব-দৃষ্ট ছবিটি দেখিতেছে। তবে তাই বলিয়া পর্যবেক্ষণকারীর সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি ঘটে না ; অর্থাৎ সে বুঝিতে পারে যে, সে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহা বাস্তব নহে—উহা তাহারই মনের সৃষ্টি।^৭ এইজন্য কেহ কেহ ইহাকে ‘অসম্পূর্ণ অমূল প্রত্যক্ষ’ (pseudo-hallucination) বলেন।

(৪) যদিও এইরূপ প্রতিরূপকে ফোটোগ্রাফের প্রতিরূপ (photographic image)-এর সহিত তুলনা করা হয়, তাহা হইলেও ফোটোগ্রাফের ছবির তায় উহা সম্পূর্ণ নিখুঁত নহে। কারণ দেখা যায় যে, শিশুগণ তাহাদের ঔৎসুক্যের তারতম্য অনুসারে ছবির এক একটি অংশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তাহা ছাড়া, তাহাদের কল্পনায় তাহারা ছবির সামান্য সামান্য পরিবর্তনও করে।^৮

(৫) বয়োরুদ্ধির সহিত আইডেটিক্ প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং পরিণতবয়স্কদের মধ্যে এই ক্ষমতার যথেষ্ট অভাব দেখা দেয়। ইহার কারণ-স্বরূপ আল্পোর্ট প্রমুখ লেখকগণ মনে করেন যে, এই প্রকার প্রতিরূপ গঠনের মাধ্যমে শিশুর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়—এই বয়সে শিশুরা সাধারণতঃ বিবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া মূর্তচিন্তা (concrete thought) করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এইজন্য শিশুরা যাহা পর্যবেক্ষণ করে তাহার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যের উপরই তাহারা অনেক সময় মনোযোগ অর্পণ করে এবং এইগুলি তাহাদের মনে গভীর

৭ তুলনীয় : “It is never localized ‘within the head’ as the memory image so often is, but ‘out there’, attached to the mat or a wall or some other surface...However, despite this ‘outer’ character of the image, the subject always recognizes that it is a purely subjective phenomenon.” (I. M. L. Hunter, *Memory*, p. 147).

৮ তুলনীয় : “This (eidetic) image is not strictly photographic, but rather *plastic*, and is likely to be modified by the subject’s interest.” (Woodworth, *Psychology*, 12th Ed., p. 350).

রেখাপাত করে ; সেইজন্য সহজেই তাহাদের অভিজ্ঞতা প্রতিরূপের আকারে তাহাদের মানসচক্ষে যেন ভাসিয়া উঠে। এই সকল প্রতিরূপের মাধ্যমে শিশুরা তাহাদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্টভাবে এবং সম্ভবতঃ নূতন ভঙ্গিমায় পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বিমূর্ত-চিন্তা (abstract thinking)-এর ক্ষমতা আয়ত্ত হয় এবং তখন প্রতিরূপের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকে আয়ত্তাধীন করিবার প্রয়োজন আর অধিক অনুভূত হয় না।^৯

৪। প্রতিরূপ-গঠনের ক্ষমতার পার্থক্য (Differences in respect of image-formation) :

স্মৃতি-প্রতিরূপ-গঠনের ক্ষমতা সকলের সমানভাবে থাকে না। কাহারও কাহারও প্রতিরূপ খুব স্পষ্ট থাকে, কাহারও অস্পষ্ট থাকে এবং কাহারও কাহারও প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। এ বিষয় গ্যাল্টন্‌ একটি অনুসন্ধানকার্য চালান। তিনি ১০০ জন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়া পাঠান যে, প্রাতরাশের টেবিল (breakfast table)-এর কথা চিন্তা করিলে কী ছবি বা প্রতিরূপ তাহাদের মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে, এবং ঐ প্রতিরূপে কোন্ প্রকার সংবেদনের স্মৃতির প্রাধান্য আছে এবং ঐ প্রতিরূপ কতদূর স্পষ্ট। গ্যাল্টন্‌ যখন বিভিন্ন উত্তরদাতার উত্তরগুলি আলোচনা করিলেন, তখন দেখিলেন যে, এই ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে। দেখা গেল যে, কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে প্রাতরাশের টেবিল এবং উহার উপর রক্ষিত পাত্রাদির আকার, রঙ, ইত্যাদির স্মৃতির প্রাধান্য, কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে ভোজ্যদ্রব্যের গন্ধের স্মৃতির প্রাধান্য, আবার কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে স্পর্শের স্মৃতির প্রাধান্য। আবার ইহাও দেখা গেল যে, কাহারও প্রতিরূপ স্পষ্ট, কাহারও অস্পষ্ট, আবার কেহ কেহ বা কোন

৯ আল্‌পোর্টের ভাষায় : "The eidetic image seems to serve essentially the same purpose in the mental development of the child as does the repetition of the stimulus situation. It permits the concrete 'sensory' aspects of the surrounding world to penetrate thoroughly into his mind." (British Journal of Psychology, 1924).

প্রতিরূপ-গঠনে একেবারে অক্ষম এবং তাহারা কেবলমাত্র ভাষার মাধ্যমেই তাহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছে।^{১০}

গ্যাল্টনের পরও মনোবিদগণ এ বিষয় অন্বেষণ করেন। তাহাদের অন্বেষণের ফল মোটামুটি এই প্রকার। সকল ব্যক্তির প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা সমান নহে—কাহার প্রতিরূপগুলি স্পষ্ট (vivid), কাহারও বা অস্পষ্ট (hazy), আর কেহ কেহ এই ব্যাপারে প্রায় অপারগ। যাহারা প্রতিরূপ-গঠনে সক্ষম তাহাদেরও প্রতিরূপের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকারের। কাহারও প্রতিরূপে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার স্মৃতির প্রাধান্য—ইহাদের বলা হয় **দৃষ্টিধর বা চাক্ষুষ-প্রতিরূপ-গোষ্ঠীভুক্ত (visual type)**; কাহারও স্মৃতিরূপে শ্রোত্র অভিজ্ঞতার প্রাধান্য—ইহাদের বলা হয় **শ্রোত্রধর বা শ্রোত্র-প্রতিরূপ-গোষ্ঠীভুক্ত (auditory type)**; কাহারও অভিজ্ঞতায় গতিবৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতার প্রাধান্য—ইহাদের বলা হয় **গতীয়-প্রতিরূপ-গোষ্ঠীভুক্ত (motor type)**। ইহা ছাড়া, রাসন, স্পর্শন ও ভ্রাণজ প্রতিরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিও আছে (তবে মনে হয় যে, ভ্রাণজ-প্রতিরূপ-বিশিষ্ট মানুষ বোধ হয় সর্বাধিক কম)। ইহা ব্যতীত এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহাদের প্রতিরূপে একাধিক সংবেদনের স্মৃতি মিশ্রিত থাকে—ইহাদের বলা হয় **মিশ্র শ্রেণীভুক্ত (mixed type)**। তবে এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগ আপেক্ষিক অর্থে ধরিতে হইবে—তথাকথিত শ্রেণীগুলি একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা পৃথক থাকে না।

আবার স্মৃতিপ্রতিরূপ-গঠনের উপযোগী সময়ও এক একটি থাকে। মানুষ যখন কর্মব্যস্ত থাকে, তখন তাহার মনোবাজ্যে প্রতিরূপের প্রাধান্য কম থাকে; অপরপক্ষে, নিজার অব্যবহিত পূর্বে ব্যক্তি-বিশেষ যখন ‘অর্ধনিদ্রিত অর্ধজাগ্রত অবস্থা’ (hypnagogic state)-তে থাকে তখন প্রতিরূপের প্রাধান্য ঘটে।

তাহা ছাড়া, মূর্ত বস্তুর চিন্তায় প্রতিরূপ সাধারণতঃ প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু বিমূর্ত চিন্তায় প্রতিরূপের স্থান বিশেষ থাকে না। এইজন্য যে

১০. আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাতেও দেখিতে পাই যে, একই অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে। যেমন, কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া যদি কোন অভিনয় দেখিয়া আসিয়া উহা বর্ণনা করে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, কেহ বর্ণনা করে অভিনেতৃবর্গ কিরূপে সাজ-পোষাক করিয়াছে, কেহ বর্ণনা করে তাহারা রঙ্গমাঞ্চে কিরূপ হাত-পা নাড়িতেছিল, আর কেহ বা বর্ণনা করে তাহারা কী ভাষা অভিনয় কালে ব্যবহার করিতেছিল।

সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ বিমূর্ত চিন্তায় লিপ্ত থাকে, তাহাদের প্রতিক্রপ-গঠনের ক্ষমতা কমিয়া যায়।

৫। স্মৃতির স্বরূপ ও উহার বিশ্লেষণ (Nature and analysis of Memory) :

১। আমরা দৈনন্দিন জীবনে বহুবিধ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহাদের সবগুলি আমাদের মনের উপর সমানভাবে রেখাপাত করে না। ইহাদের কতকগুলি প্রত্যক্ষের অবসানের পর অবলুপ্ত হইয়া যায়, আর কতকগুলির প্রভাব মনোমধ্যে সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায় এবং ভবিষ্যতে সুযোগমত তাহারা ‘মানসিক আলেখ্য’ বা প্রতিক্রপের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। অতীতের অভিজ্ঞতাকে যতদূর সম্ভব প্রতিক্রপের আকারে পুনরুজ্জীবিত করাকে স্মরণ করা বা স্মৃতি বলে।

স্মৃতিকে ‘বিশ্লেষণ’ করিলে উহার মধ্যে নিম্নলিখিত ‘উপাদান’ (factors) পাওয়া যায় :

(১) স্মৃতির জন্ম প্রথম প্রয়োজন অভিজ্ঞতালভ ও শিক্ষণ (acquisition & learning)। যে বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কখনও অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই, বা যাহা কখনও আমরা শিক্ষা করি নাই, সে সম্বন্ধে কোন স্মৃতি সম্ভব নহে। যেমন, যে কখনও ইংলণ্ডে যায় নাই এবং বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার পক্ষে ঐ রাজপ্রাসাদের স্মৃতি হইতে পারে না। সেইরূপ যে কখনও একটি বিশেষ পুস্তক পড়ে নাই, সে ঐ পুস্তকে কী আছে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। যে কখনও মোটর গাড়ী চালনা শিক্ষা করে নাই, তাহার পক্ষে ঐরূপ গাড়ী যথাযথভাবে চালাইবার স্মৃতি হইতে পারে না। সুতরাং অভিজ্ঞতা হইল স্মৃতির প্রথম সোপান।

(২) যদিও স্মৃতির জন্ম অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তাহা হইলেও অভিজ্ঞতা-মাত্রেরই স্মৃতি সম্ভব নহে। স্মৃতির জন্ম অভিজ্ঞতালব্ধ বা শিক্ষালব্ধ বিষয়-বস্তুকে সংরক্ষণ করিয়া রাখা প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুগুলির মধ্যে যেগুলি মনের উপর রেখাপাত করিতে পারে, সেইগুলির

চিহ্ন (trace) মনোমধ্যে সংরক্ষিত হয়। যে সকল অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন প্রকারে মনোমধ্যে রক্ষিত হয় না, সেগুলির স্মৃতি সম্ভব হয় না। স্মৃতির সংরক্ষণ (retention) হইল স্মৃতির দ্বিতীয় সোপান।

(৩) পুরাতন অভিজ্ঞতা মনোমধ্যে সংরক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নহে। উহাকে আবার পুনরায় প্রতিকল্পের মাধ্যমে পুরাতন অভিজ্ঞতার সহিত সমতা রাখিয়া জাগ্রত করিতে হইবে। স্মৃতির পুনর্জন্ম বা পুনরুজ্জীবীকরণ (reproduction বা revival) হইল স্মৃতির তৃতীয় সোপান।

(৪) আবার ইহাই যথেষ্ট নহে। যে অভিজ্ঞতা প্রতিকল্পের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহা যে ব্যক্তি-বিশেষের স্বীয় পুরাতন অভিজ্ঞতারই প্রতিকল্প সেইভাবে সে যেন উহাকে বুঝিতে পারে বা চিনিতে পারে। ইহাকে বলে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition)। অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ যখন কোন কিছু স্মরণ করে, তখন তাহার মনে এই ধারণা থাকে যে, যে ব্যক্তি এখন স্মরণ করিতেছে সেই ব্যক্তিই মূল (original) বিষয়টি অমুক স্থানে, অমুক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। পুনরুজ্জীবিত প্রতিকল্পের সহিত যেন থাকে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা (familiarity)। এইজন্য স্মৃতিমাত্রেরই পশ্চাতে ব্যক্তিগত ঐক্যাত্ম্যের চেতনা (consciousness of personal identity) থাকে।^{১১}

এখানে যেভাবে স্মৃতিকে বর্ণনা তথা বিশ্লেষণ করা হইল তাহাতে একরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে যে, স্মৃতি হইল অভিজ্ঞতাসঞ্চয়, সংরক্ষণ, পুনর্জন্ম এবং প্রত্যভিজ্ঞা এই চারিটি পৃথক উপাদানের সমষ্টিমাত্র (aggregate)। এই চারিটি তথাকথিত উপাদান স্থিতিশীল মানসিক অবস্থা (static mental states) নহে। স্মৃতির পশ্চাতে আছে এই চারিটির মিথস্ক্রিয়া (inter-action)। স্মৃতি একটি ক্রিয়াবিশেষ এবং এই ক্রিয়ার ফলে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নূতন করিয়া যেন সংগঠন ও

১১ বিষয়বস্তুর অহং-জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্নতা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ব্যক্তি-বিশেষ অনেক সময় স্বীয় অতীতকে ভুলিয়া যায়। (পৃ: ২৭৫-৭৬)। স্মৃতির ক্ষেত্রে অহং-জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া অনেকে বলেন : "Memory is not so much the memory of the thing remembered as of the self remembering."

বিজ্ঞান (new organization and arrangement) সাধিত হয়।^{১২} এইজন্য যদিও স্মৃতির সংজ্ঞায় বলা হয় যে, ইহা অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন, তাহা হইলেও স্মৃতি-প্রতিক্রিয়া অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ আলেখ্য বা অনুলিপি (copy) হইতে পারে না। স্মৃতির প্রতিক্রিয়ার ভিতরও অল্পবিস্তর নূতনত্ব আছে—কারণ ইহা অতীত অভিজ্ঞতাকে কোন-না-কোন ভাবে পরিবর্তিত করিয়া প্রতিক্রিয়ার আকার দেয়। অতীত অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে, তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে স্মরণকারীর প্রতিজ্ঞাস (attitude) ও অবস্থা (emotional state)-এর উপর।^{১৩}

৬। মনে রাখা বা সংরক্ষণ (Problem of Retention):

স্মৃতির একটি প্রধান সমস্যা হইল অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ (retention of past experiences)। এই প্রসঙ্গে দুইটি প্রশ্ন উঠে : (ক) কি ভাবে পুরাতন অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত হয়? (খ) অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে কোন্গুলি মনের উপর বিশেষ রেখাপাত করে যাহার ফলে তাহারা সংরক্ষিত হয়?

১২ ভুলনীয় : “It is certainly fallacious to assume that the previous experience has gone into cold storage in the interval and re-emerged intact. A memory is a *new* experience determined by the dispositions laid down by a previous experience.” (Ross, *Groundwork of Educational Psychology*, p. 184).

১৩ প্রাচীনপন্থী অনুভববাদী এবং অব্যবহাঙ্গিক স্মৃতিকে কতকগুলি স্থিতিশীল অবস্থার সমাবেশ বলিয়া মনে করিতেন। তাহা ছাড়া, তাহারা অনুভবের শক্তি (associative force)-কে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করিতেন।

ক্রিয়াবাদের প্রসারের ফলে স্মৃতিকে মানসিক কার্য (mental act) রূপে ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল। স্মৃতির কার্যের ফলে পুরাতন অভিজ্ঞতা যে পুনঃ সংগঠিত হয় তাহা ক্রমশঃ স্বীকৃত হইল—স্মৃতিকে reduplicative না বলিয়া reconstructive আখ্যা দেওয়া হইল। বার্টলেট (Bartlett), লেভিন (Lewin) প্রমুখ মনোবিদগণ স্মৃতির ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিজ্ঞাস, অর্থ (meaning) ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেন। স্মৃতির ক্ষেত্রে নিজস্ব জ্ঞানের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রেড্ ও তাঁহার অনুগামীগণ।

আবেগ ইত্যাদি যে অনুভবকে প্রভাবিত করিতে পারে সে বিষয় Thomas Brown উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

(ক) আমাদের প্রথম প্রশ্ন হইল : সংরক্ষণ কিভাবে হয় ?—এই প্রশ্নের উত্তরে মনোবিদগণ প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত ।

একদল দেহযন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণকে ব্যাখ্যা করেন ।

মিল (Mill), কার্পেন্টার (Carpenter) ইত্যাদি মনে করেন যে, যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহে উদ্দীপনের ফলে কম্পন সুরু হয় ; কিন্তু যখন আমরা উহা আর প্রত্যক্ষ করি না, তখনও কিছু কিছু স্নায়ু অতি ক্ষীণভাবে কাঁপিতে থাকে । যদি এই কম্পনের মাত্রা কোনভাবে একটু দ্রুত বা শক্তিশালী করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে আবার পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয় ।

সেইরূপ জেম্‌স্‌ মনে করেন যে, অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ একপ্রকারের দৈহিক ঘটনা (physical phenomenon) । জেম্‌স্‌ বলেন যে, যখন কোন অভিজ্ঞতা শেষ হইয়া যায়, তখন উহা মস্তিষ্কের কোন অংশে কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া যায় । অর্থাৎ মস্তিষ্ক মধ্যে ইহারা নূতন স্নায়ুপথ রচনা করে এবং উহারই ফলে অতীত অভিজ্ঞতাকে আবার পুরুজ্জীবিত করা যায় । (এই মতবাদকে বলে ‘theory of permanent modifications of the brain-structure’) ।^{১৪}

ব্যবহারবাদী ওয়াটসন্‌ মনে করেন যে, স্মৃতি হইল পূর্ব হইতে হস্ত, বাক্যজ্ঞ অথবা আন্তর্যযন্ত্র যে সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারই পুনঃপ্রকাশ ।^{১৫}

বলা বাহুল্য, এই সকল মতবাদ স্মৃতির কোন স্মৃষ্টি ব্যাখ্যা দেয় না । স্মৃতি একটি মানসিক ক্রিয়া ; স্মরণাৎ নিছক দেহযন্ত্রের মাধ্যমে ইহাকে ব্যাখ্যা করা সমীচীন হইবে না । তাহা ছাড়া, মিল বা জেম্‌স্‌ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা দ্বারা একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতি হইতে আর একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে পৃথক্‌ করা যায় না । আমরা কত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি—ইহারা যে সূক্ষ্ম স্নায়ুপথ রচনা করিতেছে বলিয়া জেম্‌স্‌ মনে করেন, সেগুলি অল্পবিস্তর একই প্রকারের এবং একটি স্নায়ুপথ অপর স্নায়ুপথের

^{১৪} James *Principles of Psychology*, Vol. I, Ch. XVI দ্রষ্টব্য ।

^{১৫} ওয়াটসন্‌ের ভাষায় : “(Memory)...is any exhibition of manual, verbal or visceral organization put on prior to the time of task.” (*Behaviorism*, p. 212).

সহিত এরূপভাবে মিশিয়া আছে যে, তাহাদের পৃথক্ করা কঠিন। সেইরূপ মিল্ স্মায়ুতন্ত্রর যে কম্পনের কথা বলিয়াছেন তাহাতেও বিশেষ কিছু ব্যাখ্যাত হয় না; কম্পনসমূহের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য থাকিলেও গুণগত পার্থক্য নাই। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার নির্দেশক একই প্রকারের কম্পনগুলির একটি হইতে অপরটিকে পৃথক্ করিবার উপায় নাই।

ব্যবহারবাদী ওয়াটসন্ যাহা বলিয়াছেন তাহারও বিশেষ মূল্য নাই। তিনি যেন একই কথার দ্বিগুণ করিয়াছেন। পূর্বে হস্ত, বাক্যস্ত্র ও আন্তর্যস্ত্র যাহা যাহা করিয়াছিল কেন তাহাদের পুনঃপ্রকাশ হইল, ওয়াটসন্ তাহাই ব্যাখ্যা করেন নাই।

এইজন্য আমরা যে সকল মতবাদ কেবল দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বলিয়া স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করে, সেইগুলি পরিত্যাগ করিলাম।

সুতরাং স্মৃতিকে মানসিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমরা অতীত অভিজ্ঞতার কিয়দংশ প্রতিক্রিয়া (image)-এর আকারে মনের নিজ্ঞান বা অবচেতন স্তরে সংরক্ষণ করিয়া রাখি এবং সেইগুলিই মধ্যে মধ্যে চেতন স্তরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, নিজ্ঞানের (পৃ: ৩৩০-৩২) অস্তিত্ব একটি সৃষ্ট প্রকল্প এবং ইহা ব্যতীত আমরা স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ মানসিক কার্যাবলী সম্যক্রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। সুতরাং স্মৃতির সংরক্ষণ সাধিত হয় চেতনার ক্ষেত্র বহির্ভূত অথচ মনের অন্তর্ভুক্ত নিজ্ঞান স্তরে।

(খ) আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল: কোন্ কোন্ প্রকারের অভিজ্ঞতা মনের উপর রেখাপাত করে বলিয়া সংরক্ষিত হয়?

আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই যে, যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহাই আমরা সাধারণতঃ স্মরণ করিতে পারি না এবং যাহা মনে রাখিবার চেষ্টা করি, তাহাও সকল সময় মনে রাখিতে পারি না। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উদ্দীপক এক বিশেষ প্রকারের হইলে এবং উহা মনের বিশেষ অবস্থার অনুরূপ হইলে উহা মনে রাখিবার সম্ভাবনা বেশী।

মানসিক সংরক্ষণের প্রধান সহায়ক হইল মনোযোগ। আমরা যে সকল বিষয়ের উপর অধিক মনঃসংযোগ করি, তাহা আমরা অনেকদিন মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি। এই দিক্ হইতে দেখিলে বলা যা

যে, যেগুলি মনোযোগের কারণ সেইগুলিই স্মৃতি-প্রতিরূপ সংরক্ষণের সহায়ক। আমরা মনোযোগের কারণগুলি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি (পৃ: ৪৬০-৬৫)। এই কারণগুলি যেখানে বর্তমান, সেখানে অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। (১) উদ্দীপক যদি তীব্র বা তীক্ষ্ণ (intense) এবং স্পষ্ট (vivid) হয়, তাহা হইলে উহা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই বিষয় আমরা বহুদিন মনে রাখি। (২) যদি কোন উদ্দীপক বার বার প্রত্যক্ষ করা যায় (যেমন, যদি কোন কিছু বার বার পড়া যায়, শুনা যায়, দেখা যায় ইত্যাদি), তাহা হইলে উহা বহুদিন মনে থাকে। এইজন্য পাঠ্য বিষয় বার বার আবৃত্তি করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। (৩) যে জিনিষকে আমরা পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করি (সংপ্রত্যক্ষ বা apperceive করি), তাহাও আমরা মনে রাখিতে পারি। (৪) যে বস্তু বা ঘটনা আমাদের ঔৎসুক্য বা অনুরাগ (interest)-এর অনুকূল তাহাও আমরা বহুদিন স্মরণ রাখি। যেমন, যে গণিতশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী, সে অতি সহজেই ঐ বিষয়ে মনোযোগ দিবে এবং ঐ শাস্ত্র-সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু সে বহুদিন মনে রাখিবে। (৫) আবার দেহ ও মনের সুস্থতা মনঃসংযোগের অগ্রতম কারণ; অতএব ইহাও স্মৃতির সহায়ক। সেইজন্য যখন আবেগের সুস্থিতির অভাব ঘটে বা অথবা কোন কারণে মানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য দেখা যায় বা যখন দেহ অসুস্থ থাকে, তখন যে বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায় বা যে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, তাহা মনের উপর বিশেষ রেখাপাত করে না এবং উহার স্মৃতিও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ইহা ছাড়া, কতকগুলি ব্যাপারে—যেমন, আবৃত্তি (rote learning)-এর ক্ষেত্রে—প্রোঢ় ও বার্ধক্য অবস্থা অপেক্ষা তাকণ্য ও শৈশবাবস্থা অধিকতর অনুকূল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে যে সকল গবেষণা করা হইয়াছে তাহার ফলাফল নিম্নরূপ :

(ক) যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা (I. Q.) অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহারা দ্রুত অধিকতর বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে এবং মনে রাখিতে পারে।

(খ) যাহারা দ্রুত অধীত বিষয় আয়ত্ত করে বা শিক্ষা করে, তাহাদের ধারণা বা সংরক্ষণের ক্ষমতা অধিক। যাহারা মন্থর গতিতে শিক্ষা করে (অর্থাৎ যাহারা slow learner), তাহাদের ধারণাশক্তি অধিক নহে।

(গ) যেগুলি অর্থবোধক (meaningful), সেগুলি অর্থহীন শব্দ অপেক্ষা দ্রুত আয়ত্ত করা যায় এবং বহুদিন মনে রাখা যায়।

(ঘ) যেখানে অধীতব্য বিষয়বস্তু অধিকতর ব্যাপক হয়, সেখানে সংরক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যাপকতর বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিবার জন্য যে শক্তি ব্যয়িত হয়, সংরক্ষণের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির দ্বারা তাহার যেন ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়।

(ঙ) যেখানে শিক্ষিতব্য বিষয়বস্তু তৃপ্তিদায়ক (pleasant), তাহা সহজেই শিক্ষা করা যায় এবং বহুদিন মনে রাখা যায়।^{১৬}

(চ) কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহুদিন মনে রাখিতে হইবে এইরূপ সঙ্কল্প বা মানসিক প্রস্তুতি (set বা preparation) লইয়া যখন কেহ কোন কিছু শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, তখন সে উহা বহুদিন মনে রাখিতে পারে।

(ছ) তাহা ছাড়া, কিছু সময়ের ব্যবধান অন্তর যখন কেহ কোন বিষয় পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে বা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করে (যাহাকে বলা হয়, 'spaced repetition') তখন সে বহুদিন উহা মনে রাখিতে পারে।

৭। মনে করা, পুনর্জন্মন বা পুনরুজ্জীবন (Problem of Revival, Recall or Reproduction) :

স্মৃতির সার্থকতা সংরক্ষিত বিষয়বস্তুকে পুনরুজ্জীবিত করার মধ্যে। যেখানে মনের বিষয় মনেই থাকিয়া যায়, সেখানে তাহা কার্যক্ষেত্রে উপকারী হয় না।

১৬ কেবল পড়াশুনার ক্ষেত্রে নয়, সকল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই ইহা দেখা যায়। একবার এক অধ্যাপক ক্রীষ্টমাসের ছুটির পরই ছাত্রদের বলেন যে, ছুটির সময় তাহারা যে সকল বিষয়ে আনন্দ পাইয়াছিল এবং যে সকল বিষয়ে তাহারা দুঃখ পাইয়াছিল সেগুলি পৃথক পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে। অধ্যাপক তাহাদের বিবৃতিগুলি রাখিয়া দিলেন। ছয় সপ্তাহ পরে হঠাৎ তাহাদের ঐ একই বিষয় আবার লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। দুইটি বিবৃতি তুলনা করিয়া দেখা গেল যে, প্রথম বিবৃতিতে তাহারা যে সকল ঘটনা অতৃপ্তিকর বা দুঃখদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, সেগুলির শতকরা ৪০ ভাগ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

এই পুনরুজ্জীবন কি ভাবে সম্ভব হয়? ইহা সম্ভব হয় অভিভাবন (suggestion)-এর ফলে। কিন্তু কেন এক বিষয় অপর বিষয় মনে করাইয়া দেয়? ইহার উত্তরে সাধারণতঃ বলা হয় যে, যে সকল বিষয় কোন-না-কোন ভাবে মনোমধ্যে অনুযুক্তবদ্ধ (associated) হইয়া আছে, তাহাদের কোন একটি চিন্তা করিলে বা অভিজ্ঞতা করিলে অপরটি মনে পড়িয়া যায়।

অনুযুক্ত সাধারণতঃ তিন প্রকারের—নৈকট্য-অনুযুক্ত (contiguous association), সাদৃশ্য-অনুযুক্ত (association by similarity) এবং বৈপরীত্য-অনুযুক্ত (association by contrast)। ইহাদের ভিত্তিতে অনুযুক্ত সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম (law) রচিত হইয়াছে—(ক) নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Contiguity), (খ) সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Similarity) এবং (গ) বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Contrast)।

(ক) নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতি—

যেখানে দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থানগত বা কালগত নৈকট্য থাকে, তাহাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যদি দুই বা ততোধিক বস্তু বা ব্যক্তিকে একই স্থানে পূর্বে বহুবার প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে বা যদি দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে একই সময়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের একটি প্রত্যক্ষ করিলে বা চিন্তা করিলে বা একটির কথা শুনিলে, অপরটি সম্বন্ধে স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে। যেমন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন ও গোলদীঘি পরস্পরের সন্নিহিতে অবস্থিত—ইহাদের দুইটিকে আমরা যুগপৎ বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং ইহাদের মধ্যে নৈকট্যের অনুযুক্ত স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্ত ইহাদের একটির কথা ভাবিলে অপরটির কথা মনে পড়িবার সম্ভাবনা; অর্থাৎ গোলদীঘির কথা ভাবিলে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের কথা চিন্তা করিলে গোলদীঘির কথা মনে পড়িতে পারে। সেইরূপ একই সময় যদি দুইটি ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে একটির কথা স্মরণ করিলে অপর একটির কথা মনে পড়িতে পারে—যেমন, ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল;

ইহা স্মরণ করিলে ঐ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া যাইতে পারে। আবার, দুইটি ছাত্র ক্লাসে একই সঙ্গে বসে, একই সঙ্গে বেড়াইতে যায়, একই সঙ্গে অধ্যাপকের নিকট আলোচনার জন্ত আসে— তাহাদের দুইজনকে একই স্থানে এবং সময়ে অনেকবার দেখার জন্ত অধ্যাপক যদি কখনও তাহাদের একজনকে একাকী দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার অপর ছাত্রটির কথা মনে পড়িতে পারে।

(খ) সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতি—

যদি দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন, যদি দুই ভ্রাতার মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের একজনকে দেখিলে অপরকে মনে পড়িয়া যায়। সেইরূপ কবি কালিদাসের প্রতিভা কবি শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবিরা যে সকল উপমা ব্যবহার করেন, তাহাদের মূলে আছে সাদৃশ্য; যেমন, ব্যক্তি-বিশেষের সৌন্দর্য কবিকে চন্দ্রের সৌন্দর্য স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।

(গ) বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি—

যদি দুইটি বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন, সুন্দর কুংসিতকে, দীর্ঘাঙ্গ খর্বাকারকে, স্থলদেহী ক্ষীণদেহীকে, সাধু অসাধুকে, আলো অন্ধকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।

অনুষঙ্গ-সম্বন্ধীয় এই তিন নীতি পরস্পর হইতে একেবারে পৃথক্ নহে। বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি সম্পূর্ণ পৃথক্ বা স্বাধীন নীতি নহে। বৈপরীত্যের পশ্চাতেও এক হিসাবে সাদৃশ্য থাকে, কারণ যে দুই গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের সম্বন্ধ থাকে, তাহারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত দুইটি বিপরীত গুণ; যেমন, দীর্ঘাঙ্গ ও খর্বাকারের যে বৈপরীত্য তাহা দৈর্ঘ্য (height)-সম্বন্ধীয়; আবার সাধু ও অসাধুর যে বৈপরীত্য তাহা নৈতিক গুণ সম্বন্ধীয়—এইজন্য দীর্ঘাঙ্গ ও অসাধু এই দুই-এর মধ্যে বৈপরীত্যের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। সুতরাং যেহেতু বৈপরীত্য সাদৃশ্যেরই অন্তর্ভুক্ত সেইজন্য বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নীতি পৃথক্ নীতি নহে।

আবার কেহ কেহ নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতিকে সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতিতে রূপান্তরিত করেন। আবার অপর এক দল সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতিকে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতিতে রূপান্তরিত করেন।

সুতরাং এই তিন নীতির কোন্টি প্রধান সে আলোচনার মীমাংসা নিরর্থক। হামিল্টন্ (Hamilton) এই তিনটি নীতিকে আর একটি নীতির অন্তর্গত করেন—তিনি তাঁহার নূতন নীতির নাম দেন ‘সমগ্রাকরণ সম্বন্ধীয় নীতি’ (Law of Redintegration)। এই নীতি হইল : “যদি একটি সমগ্র শ্রেণীর একটি অংশকে মনে পড়ে, তাহা হইলে উহা সমগ্র শ্রেণীকে মনে পড়াইয়া দিতে পারে।”^{১৭} যেমন, কলিকাতার গোলদীঘি, বিশ্ব-বিদ্যালয়-ভবন ইত্যাদি মিশিয়া একটি সমগ্র স্থান—ঐ সমগ্র স্থানের অন্তর্ভুক্ত একটি স্থানকে (যথা, গোলদীঘি) মনে পড়িলে উহা সমগ্র স্থানকে মনে পড়াইয়া দেয় এবং সেই কারণে ঐ সমগ্র স্থানের আর একটি অংশ (যথা, বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন) মনে পড়িতে পারে। এইভাবে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নীতি হামিল্টনের নীতিতে রূপান্তরিত করা যায়। কলিকাতার অক্টারলোনি মনুমেন্ট দিল্লীর কুতব মিনারকে মনে পড়াইয়া দিতে পারে—কারণ এই দুইটিই দীর্ঘ স্তম্ভ-শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং ইহাদের একটিকে মনে পড়িলে সমগ্র স্তম্ভ-শ্রেণীটিই মনে পড়ে এবং ইহার ফলে অপরটি মনে পড়িয়া যায়। এই ভাবে আবার সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নীতিকে হামিল্টনের নীতিতে রূপান্তরিত করা যায়।

অভিসারী ও অপসারী অভিভাবন :

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, অনুষঙ্গবদ্ধ বিষয়গুলির একটি অপরটিকে মনে করাইয়া দেয়, কারণ অনুষঙ্গবদ্ধ বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে অভিভাবনশক্তি (suggestive force) আছে।

অভিভাবন দুই প্রকারের হইতে পারে—অভিসারী অভিভাবন (convergent suggestion) এবং অপসারী অভিভাবন (divergent suggestion)। অভিসারী অভিভাবনের ক্ষেত্রে বিবিধ ধারণা (ideas) একই বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত হয়। যেমন, ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ‘ঘ’, ‘ঙ’, এই পাঁচটি ধারণা ‘ব’ নামক একই বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে;

১৭ ডুললীর : “Part being given, it tends to revive the whole.”

স্মৃতির ক, খ, গ, ঘ, ঙ প্রতিটি হইতেই আমরা ‘ব’-এর ধারণা বা চিন্তায় উপনীত হইতে পারি। যেমন, হয়ত’ আমার কলম হারাইয়া গিয়াছে, উহা কোথায় রাখিয়া দিয়াছি তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। আমি একবার জামার পকেট, একবার টেবিলের ড্রয়ার, একবার যে বন্ধুকে ধার দিয়াছিলাম তাহার কথা ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে কোথায় কলমটি রাখিয়া দিয়াছি তাহা হয়ত’ মনে করিতে পারিলাম। এইভাবে বিবিধ ধারণা কলমটির চিন্তার উপর কেন্দ্রীকরণকে অভিসারী অভিভাবন বলা যায়।

অপরপক্ষে, যদি একটি বিষয়বস্তুর চিন্তা হইতে আমরা বিবিধ ধারণায় চলিয়া যাই, তাহা হইলে উহাকে অপসারী অভিভাবন বলে। যেমন, ‘ব’ নামক বস্তুর চিন্তা হইতে যদি আমরা, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি বিবিধ ধারণায় উপনীত হই, তাহা হইলে উহা হইবে অপসারী অভিভাবন। যেমন, ইংলণ্ড-এর কথা চিন্তা করিতে করিতে শৈত্য, ইংরাজী ভাষা, বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় মনে পড়িতে পারে। এইভাবে ‘এক’ হইতে ‘বহু’-তে গমনকে অপসারী অভিভাবন বলা যায়।

অনুঘটের সহায়ক অন্যান্য উপাদান :

প্রাচীনপন্থী মনোবিদগণ অনুঘটবাদ (Associationism)-এর প্রভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, বিভিন্ন মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পর হইতে পৃথক্ এবং অনুঘটের প্রভাবে উহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়। আধুনিক মনোবিদ্যা এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়াছে। সাধারণতঃ আধুনিক মনোবিদগণ মানসিক অভিজ্ঞতাগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন স্থিতিশীল অবস্থা বলিয়া মনে করেন না—বাহ্যপরিবেশের সহিত মনের প্রতিক্রিয়ার ফলে বিবিধ অভিজ্ঞতার উৎপত্তি। এইগুলির প্রত্যেকেরই একটি সামগ্রিক রূপ আছে যাহাকে কেবলমাত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না।

প্রাচীন অনুঘটবাদীরা মনে করিতেন যে, যে-কোন দুইটি বিষয়ের একই সঙ্গে কয়েকবার অভিজ্ঞতা ঘটিলে উহাদের মধ্যে অনুঘটের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। যে বিষয়গুলি অনুঘটবদ্ধ হয়, তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই তাহারা সহজে

অনুযায়ী হইতে পারে ; সুতরাং দুই বা ততোধিক বিষয়ের অনুযায়ী কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার সংখ্যার উপরই নির্ভর করে না, উহাদের নিজস্ব গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। রসায়নশাস্ত্রে যেমন দেখা যায় যে, যে-কোন মৌলিক উপাদান যে-কোন মৌলিক উপাদানের সহিত সংযুক্ত হইয়া কোন যৌগিক দ্রব্য গঠন করে না, সেইরূপ মনোজগতেও যে-কোন বিষয়বস্তুর অভিজ্ঞতা যে-কোন অন্য বিষয়বস্তুর অভিজ্ঞতার সহিত সংযুক্ত হয় না। অভিজ্ঞতার প্রতি বিষয়বস্তুরই নিজস্ব একটি গঠন (organization) থাকে এবং দুইটি বিষয়বস্তুর গঠন-বৈচিত্র্য পরস্পরের অনুকূল হইলে উহারা সহজেই অনুযায়ী হইতে পারে। সুতরাং অনুযায়ী নিজেই হইল বিশেষ প্রকার সংগঠনের ফল।^{১৮}

বিষয়বস্তুর যে সংগঠন থাকে তাহা সকল সময়ই বস্তুগত নহে, তাহা অনেকাংশে অভিজ্ঞতাকারীর মনের দ্বারা আরোপিত হয়। (পৃ: ৬১৮-১৯)। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অভিজ্ঞতাকারীর মানসিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী—যথা, আবেগ, প্রতিভাস (attitude) ইত্যাদি—দ্বারাও অনুযায়ী প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, পাঠ-শিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেখানে বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে স্বসংবদ্ধ অর্থ (meaning) থাকে, সেগুলির মধ্যে সহজেই অনুযায়ী স্থাপিত হয়।

কেবল যে অভিজ্ঞতাকালীন অনুযায়ীর উপরই বিবিধ মানসিক অবস্থা ও প্রতিভাস (mental conditions and attitudes) প্রভাব বিস্তার

১৮ গেস্টাল্টবাদীরা এই অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রচলিত অনুযায়ীবাদের সমালোচনা করিয়া কোয়েলার (Köhler) বলেন: "A and B happen to occur together and, whatever the nature of A and B may be, the bond is produced between them! I do not know a single law or rule in physics or chemistry which might be compared in this respect with the concept of association...The assumption of discrete bits of process, altogether indifferent to each other underlies the classical concept of association, for, without even mentioning the actual properties of A and B in their relations to each other, it states that *any* A and *any* B may acquire that neutral bond, if it is supposed only that they occur together a number of times." "Our conclusion is that association depends upon organization because association is just an after-effect of an organized process." (*Gestalt Psychology*, pp. 280-81, 299).

করে, তাহা নহে ; পুনরুজ্জীবন বা মনে করার সময়ও মানসিক অবস্থা এবং প্রতিশ্রুতি প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ অভিভাবনজনিত শক্তি (suggestive force) কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্রিয়া করে না। সুতরাং অতীতকে কিভাবে, কত দূর এবং কখন আমরা মনে করিতে পারিব, তাহা মনে করিবার চেষ্টাকালীন মানসিক অবস্থা ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।^{১৯} বার্টলেট, হার্টমান, ক্লার্ক ইত্যাদি যে সকল পরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।^{২০}

আধুনিক মনোবিদগণ অনুষঙ্গবাদের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার অর্থ ইহা নহে যে, মানসিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কখনই কোন অনুষঙ্গ হইতে পারে না। মানসিক অনুষঙ্গ যে ঘটিতে পারে বা ঘটে তাহা অস্বীকার করা যায় না ; তবে ইহা বস্তু-বিশেষের বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন এবং অভিজ্ঞতাকারীর মানসিক প্রতিশ্রুতি, আবেগানুভূতি, সহজবুদ্ধি, শিক্ষণ ইত্যাদির উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুষঙ্গকে স্মৃতির মূল কারণ না বলিয়া উহার আবার যে সকল সম্ভাব্য কারণ থাকিতে পারে, তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে।^{২১}

১৯ তুলনীয় : "It we are to treat the problems of association as functional, we have to use attitudes, orientation, appetitive and instinctive tendencies and interests as our active, organising factors." (Bartlett, *Remembering*, p. 307).

২০ হার্টমান, এডওয়ার্ডস ইত্যাদি একটি পরীক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন যে, পরীক্ষণ-পাত্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্মৃতির বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করিয়াছে। সেইরূপ ক্লার্ক আর একটি পরীক্ষণ করেন : তিনি একদল ছাত্রছাত্রীকে একটি কাহিনী বলেন যাহার বিষয়বস্তু ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানভেদে জন্ত পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ; পরে যখন ঐ কাহিনীটি স্মরণ করিতে বলা হয়, তখন অধিকাংশ ছাত্রই পুরুষের প্রাধান্য এবং ছাত্রীরা নারীর প্রাধান্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া কাহিনীটি পুনর্ব্যব বর্ণন।

২১ বার্টলেট (Bartlett)-এর ভাষায় : "In various senses associationism is likely to remain, though its outlook is foreign to the demands of modern psychological science. It tells us something about the characteristics of associated details, when they are associated, but it explains nothing whatever of the activity of conditions by which they are brought about together." (*op. cit.*, p. 308).

অনুষঙ্গবাদ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালের অভিমত আলোচনার জন্ত Murphy, *Historical Introduction to Modern Psychology*, Ch. 19 দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে: যদি ব্যক্তিগত আবেগ, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি অনুবন্ধের কারণরূপে কার্য করে, তাহা হইলে স্মৃতিকে অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রতিলিপি (exact copy) বলা কি ঠিক হইবে? উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলিতে পারি যে, স্মৃতিপ্রতিরূপ হিসাবে আমরা যাহা পুনরুজ্জীবিত করি, তাহা অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রতিলিপি নহে—তবে উহার সহিত অতীত অভিজ্ঞতার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে। স্মৃতিপ্রতিরূপভাবে আমাদের মনে যাহা ভাগ্রত হয়, তাহার মূলে আছে অতীত অভিজ্ঞতা; কিন্তু সংরক্ষণকালে এবং পুনরুজ্জীবনকালে উহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিশ্রুতি, আবেগ, প্রয়োজন, প্রেরণা, ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ফলে পুরাতনের ভিত্তিতে নূতনভাবে সংগঠিত হইয় স্মৃতিপ্রতিরূপগুলি জাগরিত হয়।

৮। স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষণ (Some experiments on Memory) :

(ক) এবিংহাউস্-কৃত পরীক্ষণের ফলাফল :

এবিংহাউস্ স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা করেন। তিনি পরীক্ষার বিষয়বস্তুরূপে কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি গ্রহণ করেন (যথা, lut, vol, nuz, roz)। যেহেতু অর্থপূর্ণ পদ গ্রহণ করিলে পদের অর্থের সাহায্যে পদটিকে স্মরণ করা সম্ভব হইতে পারে, সেইজন্য তিনি অর্থহীন পদ গ্রহণ করেন।

এই পরীক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই পরীক্ষক ও পরীক্ষণ-পাত্র উভয় ভূমিকাই গ্রহণ করেন। তাঁহার পরীক্ষণের ফলাফল নিম্নরূপ :

(১) তিনি দেখেন যে, শব্দ-সমষ্টিতে শব্দ-সংখ্যা যত কম থাকে, তাহাকে আবৃত্তি করার সংখ্যাও তত কম প্রয়োজন হয়, আবার উহাকে আয়ত্ত করিতে সময়ও কম লাগে। আবার শব্দ-সংখ্যা বাড়িলে উহাদের আয়ত্ত করিতে আবৃত্তি-সংখ্যাও বেশী লাগে, আবার সময়ও বেশী লাগে। বিস্তারিতরূপে সমগ্র শব্দ-সমষ্টিকে পুনরাবৃত্তি করাকেই তিনি আয়ত্তীকরণের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন।

এবিংহাউসের পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের বৈশিষ্ট্য হইল যে, যে অনুপাতে অল্পসংখ্যক শব্দসম্বলিত সমষ্টিকে আবৃত্তি করিতে হয় এবং তাহার জ্ঞাত যে সময় লাগে, তাহার তুলনায় অনেক বেশীবার আবৃত্তি এবং অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় অধিক সংখ্যক শব্দসম্বলিত সমষ্টিকে আয়ত্তীকরণের জ্ঞাত। যেমন, ৭ শব্দ সংখ্যক সমষ্টিকে আয়ত্ত করিবার জ্ঞাত এবিংহাউসের পক্ষে আবৃত্তি করার প্রয়োজন হয় ১ বার এবং সময় লাগে ৩ সেকেন্ড (অর্থাৎ প্রতি শব্দের জ্ঞাত ০'৪ সেকেন্ড) ; কিন্তু ৩৬ শব্দ সংখ্যক সমষ্টিকে আয়ত্ত করিবার জ্ঞাত তাঁহাকে আবৃত্তি করিতে হয় ৫৫ বার এবং সময় লাগে ৭২২ সেকেন্ড (অর্থাৎ প্রতি শব্দে গড়ে ২২ সেকেন্ড) । অর্থাৎ শব্দসমষ্টি দীর্ঘতর হইলে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে 'বোধ' এর সৃষ্টি হয় (ইহাকে বলা হয় inter-syllabic inhibition) এবং উহার ফলে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

আবৃত্তির সংখ্যা ও সময়-সংক্ষেপ (time-saving)-এর বিষয়ও এবিংহাউস অনুসন্ধান করেন। তিনি পরীক্ষণের সাহায্যে দেখেন যে, কোন বিষয়কে প্রথমবার আয়ত্ত করার জ্ঞাত যতবার আবৃত্তি এবং যে সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা যদি ভুলিয়া যাওয়া যায় তাহা হইলেও তাহাকে আয়ত্ত করিতে পরে অল্পবার আবৃত্তি করিতে হয় এবং সময়ও অল্প লাগে। যেমন, তিনি দেখেন যে, ১২ শব্দসম্বলিত সমষ্টিকে প্রথমবার আয়ত্ত করিতে ১৬'৫ বার আবৃত্তি করিতে হয় ; কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পরে উহাকে পুনরায় নিভুলভাবে আয়ত্ত করিতে মাত্র ১১ বার আবৃত্তি করিতে হয় অর্থাৎ ৫'৫ বার কম আবৃত্তি করিতে হয়। পুনর্বীর শিক্ষণের সময় এইভাবে কিছু সময় সংক্ষিপ্ত হইল এবং আবৃত্তির সংখ্যাও কম লাগিল। ইহাকে বলা হয় **সঞ্চয়-পদ্ধতি** (saving method) ।

এবিংহাউসের গবেষণার আর একটি বিষয়বস্তু হইল কি ভাবে আমরা ভুলিয়া যাই এবং কি ভাবে নূতন করিয়া শিখিতে হয়। তিনি শিক্ষণ এবং পুনঃশিক্ষণের মধ্যে বিবিধ সাময়িক ব্যবধান রাখিতেন—২০ মিনিট, ১ ঘণ্টা, ২ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা এবং ৩১ দিন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্রথম প্রথম বিস্মরণ যত দ্রুত হয় তাহার পর ক্রমশঃ বিস্মরণের হার কমিয়া যাইতে থাকে। প্রথম আয়ত্তীকরণ বা শিক্ষণের ১ ঘণ্টা পরে আয়ত্তীকৃত শব্দ-সমষ্টির অর্ধেকের উপর নূতন করিয়া শিখিয়া

তবে তিনি বিগুণভাবে ঐ শব্দ সমষ্টিকে পুনরাবৃত্তি করিতে পারিলেন। ৯ ঘণ্টা পরে তিনি অধীত বিষয়ের $\frac{3}{4}$ অংশ পুনর্ব্যবহার শিথিয়া গুণভাবে বলিতে পারেন, ৬ দিন বাদে অধীত বিষয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ এবং ১ মাস বাদে প্রায় $\frac{1}{8}$ অংশ আবার মুখস্থ করিয়া তবে গুণভাবে বলিতে পারেন।

এই বিষয়ে এবিংহাউন্স যে পরীক্ষণ পরিচালিত করিয়াছিলেন তাহার ফলাফল নিম্নরূপ^{২২} :

প্রথম শিক্ষণ ও পুনঃশিক্ষণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান			সংরক্ষণের শতকরা হার	ভুলিয়া যাওয়ার শতকরা হার	
২০ মিনিট	...	...	৫৮	...	৪২
১ ঘণ্টা	...	...	৪৪	...	৫৬
৯ ঘণ্টা	...	...	৩৬		
২৪ ঘণ্টা	...	...	৩৪	...	৬৬
২ দিন	...	...	২৮	...	৭২
৬ দিন	...	...	২৫	...	৭৫
৩১ দিন	...	...	২১	...	৭৯

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কুড়ি মিনিট হইতে ২ দিনের ব্যবধানের ক্ষেত্রে বিস্মরণের হার যে পরিমাণ দ্রুত ঘটিতেছিল, তাহার পর উহা আর তত দ্রুত ঘটিতেছিল না।

(খ) প্রতিজ্ঞাস, আবেগ ইত্যাদির প্রভাব সম্বন্ধে পরীক্ষণ :

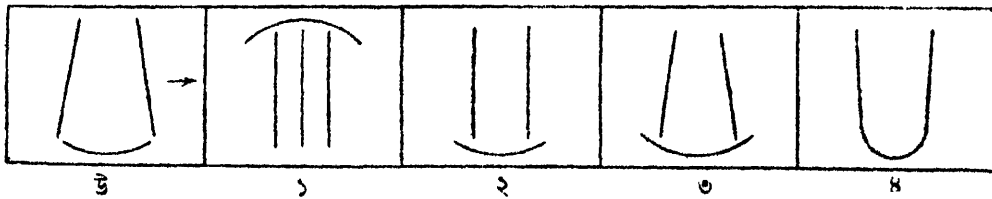
এবিংহাউন্স যে সকল পরীক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাতে অর্থহীন শব্দ (nonsense syllable) ব্যবহার করা হইত বলিয়া অনেকে আপত্তি করেন। ইহাদের অভিযোগ হইল যে, দৈনন্দিন জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন কতকগুলি অর্থহীন শব্দকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবৃত্তি (rote-memory) হইতে স্মৃতির পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বুঝা যায় না। স্মৃতি কোন নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি নহে—কতকগুলি পৃথক পৃথক উপাদানের অমুগ্ধ হইতে স্মৃতির স্বরূপ বুঝা যায় না। (পৃঃ ৬১৭-১৮)।

২২ এই পরিস্থিতিতে গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করিলে যে রেখা অঙ্কিত হয়, তাহাকে curve of retention বলে এবং ইহার মধ্যে logarithmic সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, কেবল পুরাতন অনুসন্ধান সাহায্যেই পুরাতন স্মৃতির পুনরুজ্জীবন বুঝান যায় না—কারণ অভিভাবন, প্রতিচ্ছায়া, ব্যক্তিগত স্মৃতি-অস্মৃতি, আবেগ ইত্যাদি দ্বারা উহা প্রভাবিত হয় (পৃ: ৬৩০)। এই কারণে ‘মনে করা’ বা স্মৃতির ‘পুনরুজ্জীবন’-এর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

কতকগুলি রেখাঙ্কন (linear drawing)-এর সাহায্যে ভুল্ফ (Wulf) দেখান যে, আমরা অতীতে যাহা দেখিয়াছি তাহা যখন স্মরণ করিতে চেষ্টা করি, তখন স্মৃতিপ্রতিকল্পের স্বতঃই কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তন প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়: **বর্জন ও সমীকরণ (rejection & levelling)**, **প্রধানীকরণ (sharpening)** এবং **শ্রেণীকরণ (assimilation)**। আমরা যে বস্তুকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করি তাহার কতকগুলি অংশকে বাদ দিয়া আমরা তাহার ভিতর প্রতিসাম্যতা (symmetry) আনিবার চেষ্টা করি, অর্থাৎ উহাকে সুষম আকার দিই। আবার যে অংশ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার উপর আমরা প্রাধান্য অর্পণ করি। সেইরূপ দৃষ্ট বস্তুর সহিত সচরাচর দৃষ্ট অর্থাৎ পরিচিত কোন বস্তুর সহিত যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে উহাকে স্মরণ করিবার কালে আমরা উহাকে পরিচিত বস্তুর সহিত সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করি।

নিম্নাঙ্কিত ছবিতে ‘উ’ হইল উদ্দীপক। কয়েকজন ব্যক্তিকে ইহা দেখাইয়া স্মৃতি হইতে উহাকে আঁকিতে বলা হইল। পুনরায় অঙ্কিত ছবিগুলি (১, ২, ৩, ৪ চিহ্নিত) দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কোন ক্ষেত্রে কিছু বর্জিত কোন ক্ষেত্রে কিছু সমীকৃত, আবার কোন ক্ষেত্রে কিছু প্রধানীকৃত হইয়াছে।



স্মৃতিপ্রতিকল্পের পরিবর্তন।

[পরীক্ষণটি Gibson কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত। *Jr. of Exp. Psy.*, Vol. 12 দ্রষ্টব্য।]

ভুল্ফের পরে যে সকল গবেষক পরীক্ষা চালান তাঁহারা মনে করেন

যে, কেবল সময়ের গতিতেই যে ধীরে ধীরে বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটে, তাহা না হইতে পারে; হয়ত' ছবিগুলিকে প্রথম দর্শনের সময়ই মনে মনে কোন না কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার পরীক্ষণের ফলেও দেখা যায় প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু কত দ্রুত পরিবর্তিত হয়। একটি ছবি একজন পরীক্ষণ-পাত্র দেখিয়া উহা স্মৃতি হইতে আঁকিল, দ্বিতীয় পরীক্ষণ-পাত্র প্রথম ব্যক্তির অঙ্কিত ছবি একবার দেখিয়া লইয়া স্মৃতি হইতে আঁকিল, তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ছবি দেখিয়া স্মৃতি হইতে আঁকিল—এইভাবে দশম ব্যক্তি যে ছবি আঁকিল তাহার সহিত মূল ছবির প্রচুর প্রভেদ হইয়া গেল।^{২৩}

এইজ্ঞাত আধুনিক অনেক লেখক স্মৃতির সংজ্ঞা দিবার সময় বলেন যে, উহা পুরাতন অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রতিলিপি নহে, তবে উহা পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন সংগঠন।^{২৪} (পৃ: ৬১৮)।

(গ) স্মৃতি-প্রসর (memory span) সম্বন্ধে পরীক্ষণ :

পরীক্ষণ-পাত্র উদ্দীপক একবার প্রত্যক্ষ করিবার অব্যবহিত পরেই উহা কতদূর স্মরণ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষণ করা হইয়া থাকে। ক্ষণদৃক্যস্ত্রে অর্থহীন শব্দসমষ্টি অথবা কতকগুলি সংখ্যা উদ্দীপক হিসাবে প্রদান করা হয়; ঐ উদ্দীপক সরাইয়া লইয়া দেখা হয় পরীক্ষণ-পাত্র উদ্দীপককে কতদূর স্মরণ করিতে পারিতেছে (পৃ: ৪৭০)। ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতি-প্রসর নির্ধারণ করিবার জ্ঞাত অবলম্বিত ব্যবস্থা এইরূপ : যদি প্রথম শব্দ-সমষ্টি বা সংখ্যাসমষ্টি সে নিভুলভাবে বলিতে পারে, তাহা হইলে উত্তরোত্তর সংখ্যা বা শব্দ বাড়ান হয় এবং যে সংখ্যা পর্যন্ত সে নিভুলভাবে স্মরণ করিতে

২৩ আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই যে, একই ঘটনার বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মধ্যে কত প্রভেদ রহিয়াছে। আকস্মিক দুর্ঘটনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি উদ্বেজনার পরিস্থিতির সময় লোকের মুখে মুখে যখন তথাকথিত “সত্য কাহিনী” প্রচারিত হইতে থাকে, তখন বর্জন, সমীকরণ, প্রধানীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বশেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

২৪ ভুলনীয়: “Remembering is not the re-excitation of innumerable fixed, lifeless and fragmentary traces. It is an imaginative reconstruction or construction, built out of the relation of our attitude towards a whole active mass of organised past reactions or experience...” (Bartlett, *op. cit.*, p. 213).